অযাত্রায় জয়যাত্রা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

প্রীতিভাজন শ্রীশোভন বসুকে লেখা—

শুভার্থী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সুচরিতেষু,

কাগজে দেখলাম আমেরিকায় নাকি একটা নূতন ধুয়া উঠেছে। এটা উঠেছে কিছু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে, যাঁরা এমন কিছুকেই আমল দিতে চান না যা আমরা অতিন্দ্রিয়ের এলাকায় ফেলি—ভূত-প্রেত, পরী-হুরী, দেবদেবী ; ভগবানকে তো বিলকুলই নয়। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, বেশ, তোমরা থাকো তো ওসব ধোঁয়াটে ভাব ছেড়ে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করো বাপু—তার জন্যে পিচ-ঢালা রাস্তাও করে দিয়েছি আমরা, তার নাম হচ্ছে ল্যাবরেটারি। মনোবিজ্ঞানের দ্বারা অনেক ধোঁয়াটে জিনিসকে স্পষ্ট করে এনে এঁদের এ মনোভাবটা আরও পুষ্ট হয়েছে ; হওয়ারই কথা।

কিন্তু এখন এঁরা নাকি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, এমন সব ঘটনা বা কাণ্ড পৃথিবীতে হচ্ছে, বিজ্ঞানের (বিশেষ করে মনো-বিজ্ঞানের) চাবি দিয়ে যার আর তাঁরা রহস্যোদ্‌ঘাটন করতে পারছেন না। যেমন ধরো স্বপ্নে দেখা গেল অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক মানুষের সঙ্গে দেখা করলাম ; কিম্বা সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ এসে আমায় কিছু একটা বললেন বা কিছু দিলেন। খুঁজে-পেতে দেখা গেল এসবের মনস্তাত্ত্বিক কারণ কিছুই ঘটেনি ; আর তারপরে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—ব্যাপারটা প্রায় হুবহু ফলে গেল কয়েক দিন পরে। আমার মনে হয়, কোন বৈজ্ঞানিকই পাস্তাবুড়ীর দিদি-শাশুড়ীর মতো এমন নিরাপদভাবে নিজেকে "লোহাসিন্দুকে" আবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হননি যিনি কম-বেশ করে এই জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই মুক্ত আছেন। স্বপ্নের এই জাগ্রত জীবনে প্রতিপালনের সাফাই একমাত্র বোধহয় প্রি-ডেস্টিনেশন থিওরীতে

দিতে পারে। ওটা মেনে নিতে হলে মেনে নিতে হয় অদৃষ্টকে, সেটা মেনে নিতে হলে মেনে নিতে হয় তোমার কর্তামির বাইরে আর একজন অধি-কর্তাকে। ওটা হল দর্শনের এলাকা, দর্শন বিজ্ঞানকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের দুয়ার অবারিত করেও রেখেছে, কিন্তু বিজ্ঞান পা বাড়াবে ওদিকে ?

আরও আছে, অন্ধ সংস্কারের নামে যা চলে আসছে, কে জানে কতদিন থেকে। আমাদের আছে হাঁচি-টিকটিকি, আরও কত কি ওঁদেরও 'কত কি'ই আছে, সব বাদসাদ দিয়ে সন্থ সন্থ যেটা মনে পড়ে গেল তার কথাই ধরা যাক। ওঁদের সঙ্গে বহুদিন ঘর করায় যেগুলি সঙ্গগুণে আমাদের মধ্যে খানিকটা সঞ্চারিত হয়ে গেছে, এটি হচ্ছে তার মধ্যে একটি।

তেরো নম্বর। আজই খবরের কাগজে দেখলাম একটি নবগঠিত রাজ্যের মন্ত্রী গদিচ্যুত হলেন যাঁর নাকি ঐ সংখ্যাটি শনিগ্রহের মতো পেছনে পেছনে ঘুরছে; অভিষেক হয়েছিল তেরো তারিখে, আরও কি কি ভাবে তেরো তারিখটা তাড়া করে ফিরছে ওঁকে, তারপর এই শেষ চোটটাও দিলে ঐ তেরোই-ই। ওদের অনেক বড় বড় হোটেলেও শুনেছি তেরো নম্বরের ঘর থাকে না। থাকলে সেটা বিজ্ঞানীদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে থাকে এমন খবরও পাইনি। তেরো তারিখটা হচ্ছে ওঁদের "মলমাস"। আমাদের ভয়টা বেশি। তাই গোটা মাস-কে মাস ঠেলে রেখেছি; ওঁরা খুব ডাঁটো, একটি নির্দিষ্ট তারিখের কাছেই জোড় হস্ত; থরহরি কম্প। আমি যে নিবন্ধটি পড়েছিলাম তা ছিল সংক্ষিপ্ত, উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করে নি। যে দুই জাতীয় উদাহরণ দিলাম তা নিজের মন থেকেই দিলাম, কেননা নিবন্ধের ভাবে বোধহয় এই জাতীয় জিনিস নিয়েই কিছু বিজ্ঞানী বিব্রত বোধ করেছেন যার কোন যুক্তিসংগত জবাবদিহি পাওয়া যাচ্ছেনা—অথচ যা অলিখিত অতীত থেকে চলে এসে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করছে। স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ অর্থাৎ পরিসংখ্যানের

সাহায্য নিয়ে একটা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে, আবার হচ্ছেও অর্থাৎ হিসেব রাখা হোক ক'বার ফলে, ক'বার ফলে না; এতেও কিছু ইতর বিশেষ হচ্ছে বলে মনে হয় না।

তেরো তারিখে ওরা কোথাও যাত্রা করে বেরবে না। যাত্রার কথা তুলতে আর একটা চমৎকার উদাহরণ হাতে এসে গেল, বিবাহের মত শুভযাত্রায় ওরা অশ্লেষা ও মঘা না বাছুক, বোধহয় অতিবড় বিজ্ঞানীদেরও অনেকে মনে মনে চাইবে—বেরুবার সময়, ছেঁড়া জুতাটা একেবারে পিঠে এসে না পড়ুক অন্তত তার ধুলো যেন একটু আধটু বর-সজ্জার কোনখানটা স্পর্শপূত করে দেয়।

বুঝতে পারছি প্রশ্ন করবার জন্যে তোমার জিভ চুলকাচ্ছে, অর্থাৎ আমি নিজে তাহলে কি, বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী। সোজাসুজি উত্তর দেব না, একটা উদাহরণের সাহায্য নিই :

কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম; কুকুরেরা হাড় চাটতে এত ভালবাসে কেন? ভেতরে বাইরে শুকনো একটুকরো হাড় গেরস্তর আস্তাকুঁড়ে পড়ে আছে, তুলে নিয়ে দুপায়ে চেপে পরম তৃপ্তিতে আরম্ভ করে দিল; এদিকে ঘোরাচ্ছে, ওদিকে ঘোরাচ্ছে, চুষছে, কামড়াচ্ছে, খাতিরের আর অন্ত নেই। লেখক মাথা ঘামিয়ে একটা যে তত্ত্ব বের করেছেন তা মন্দ বোধ হল না। জান, কুকুর মানুষের একেবারে আদি সঙ্গী, একেবারে সেই প্রস্তর-যুগ থেকে যখন মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল বন্য জন্তু শিকার। কুকুরই এতে ছিল তাদের প্রধান সহকারী, কিন্তু উপার্জনের হিস্যেটা তারা যে বেশ ভদ্ররকম পেত না এটা বেশ ধরে নেওয়া যায়। মাংসচাঁচা হাড়গুলো নিয়েই তাদের প্রায় সন্তুষ্ট থাকতে হত। যদি একটু আধটু লেগে রইল তাতে তো পোয়াবারো। এই থেকে হাড় জিনিসটার সঙ্গে ওদের জাতিগত একটা যে হৃদ্যতা জন্মে যায় সেটা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, আজ পর্যন্ত তার জের চলছে, জের কখনও মিটবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

মানুষের পক্ষে অন্ধ সংস্কারগুলোও কতকটা সেই রকম্। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দেখছি, না ভেতরে না বাইরে কোথাও কিছু নেই, তবু মানবেতিহাসের কোন্ আদি যুগ থেকে যে সম্বন্ধ, তা যে কারণে আর যে ধরনেরই হোক, কোনমতেই যেন ছাড়ান-ছোড়ন নেই তা থেকে? মস্তবড় ভুল হবে যদি বল যে কুকুরের ওটা হলো লোভের ব্যাপার, তার মোহ-আকর্ষণ অন্যরকম। ঠিক তা নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ধরনটা যতই আলাদা হোক—ওটাও একটা মনোবৃত্তি, এটাও একটা মনোবৃত্তি—ওটা একটা শুকনো হাড়কে আশ্রয় করে, আমাদেরটা একটা শুকনো সংস্কার বা প্রথাকে। ভুয়ো জেনেও (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে) কেউই ছাড়তে পারছি না; ওরাও নয়, আমরাও নয়।

ব্যক্তিগত প্রশ্নই যখন উঠল, তখন আমার কথা আর একটু না হয় বলি; আমি মাঝে মাঝে এই সব সংস্কারগুলোকে সংস্কার করবার চেষ্টা করি। এই সেদিন এই ধরনের একটা চেষ্টা হয়ে গেল। যুক্তি তর্ক ছেড়ে তার কথাই বলি না হয়।

পূজার পর তোমাদের ওদিকেই যাওয়ার কথা ছিল, হঠাৎ একটু পশ্চিমে যাওয়ার উপলক্ষ্য এসে উপস্থিত হলো—পাটনার এক সাংস্কৃতিক পরিষদ থেকে একখানা চিঠি। পরিষদের উদ্বোধনী আছে, পৌরোহিত্য করতে হবে। অনেক দিন এক জায়গায় বসে-বসে হাত-পায়ের গ্রন্থিগুলাতে যেন জং ধরে গেছে; মনটা বেশ সাড়া দিয়ে উঠলো।

মন ভালো করে কোন-কিছুতে সাড়া দিয়ে উঠলে শুধু হাত-পায়ের জড়তাই নয়, আরও যদি কিছু লোহার জঙের মতোই আচ্ছন্ন করে থাকে তো সেগুলোকেও ঝেড়ে ফেলতে চায়। আর দিনক্ষণ দেখা নয়, ভেবে দেখলাম চিরকালই টিপে টিপে পা ফেলে এতটা বয়স পর্যন্ত তো কোনখানেই পৌঁছানো গেল না। একবার স্পর্ধিত পদক্ষেপের ফলাফলটাই দেখা যাক না। এখন একটা সুবিধে এই

যে অন্তত আয়ুর দিক দিয়ে আর ততটা লোকসানের ভয় নেই। আর কতটুকই বা আছে, মুঠোর মধ্যে? বড় জোর গোটা পাঁচসাত বছর; তা এই জীর্ণপ্রান্ত আয়ু গেলেই বা কি থাকলেই বা কি? ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে মহাকালের ভাণ্ডার থেকে যা হাতিয়ে নেওয়া গেছে তা নিন্দের কি এমন?

দিনক্ষণ বেশ ভালই ছিল সামনে; প্রথমতো বিজয়া, সারা বছরের মধ্যে শুভ যাত্রার একেবারে জয়তিলক পরানো দিন। বাদ-দিলাম। দুদিন বাদেই সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী; তাকেও। বেছে নিলাম একেবারে পূর্ণিমা, তার সঙ্গে লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড বলতে পার, কেননা শাস্ত্রমতে দুটোই হচ্ছে ঘরের কোণ ঘেঁসে বসে থাকবার দিন।

এইখানে আর একটা কথা বলে নিই। এই যে দিনক্ষণের শুভাশুভ বিচার এর কোন হদিস পাও তুমি? আমি তো পাই না। অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথাই ধরো। দুটো এতই আলাদা আলাদা যে একটার যা প্রভাব হবে অন্যটার তা কোন মতেই হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। বলবে অমাবস্যা যে অযাত্রা তা তার চেহারাতেই লেখা রয়েছে। মেনে নিলাম। কিন্তু পূর্ণিমা, যখন চরাচর স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, যাত্রা-পথের দশটি দিকই উন্মুক্ত, উদ্ভাসিত মনের দ্বারও যখন সম্পূর্ণ উদঘাটিত, ভেতরে বাইরে যাওয়া আসা, দেওয়া-নেওয়ার ধুম পড়ে গেছে, তখনও স্থাণু হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবার নির্দেশ, এর তাৎপর্য তো কোনমতেই বুঝে ওঠা যায় না।···আবার অন্য ধরনের রহস্যও আছে। ধরো এই মঙ্গলবার। ওটা নাকি যত অমঙ্গলের খনি। তাই যদি হয় তো সাতটা দিনের মধ্যে সবচেয়ে শুভ নামের তকমাটি ওর গলাতেই আটকে দিয়ে এ বিড়ম্বনা অথবা রসিকতাই বা কেন? তারপর দেখো···

থাক্ এই পর্যন্ত, এই ফিরিস্তির কোনখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানা যাবে না।

আমার গাড়ি দশটা দশে। এল প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে, ছাড়তে সেটাকে প্রায় এক ঘণ্টা করে নিল। ওটা আমি ধরি না। সেই পুরনো "বি এন ডব্লিউ আর'ই তো, দুবার নাম পালটে আজ না হয় এন-ই-আর হয়েছে; কিন্তু স্বভাব পালটাবে কেমন করে। এর সঙ্গেই যখন ঘর করতে হবে, এসব খুঁটিনাটি ধরিনা। আজ কিন্তু এই ব্যাপারটুকুর মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা অনিষ্টের বীজ লুকিয়ে রইল—অদৃশ্য এক ছিদ্র পথে শনি প্রবেশ করে রইল বলতে পার। ওদিককার হিসাব ধরে বলা যায় পূর্ণিমা তার প্রথম ধাক্কা দেওয়ার জন্যে ওৎ পেতে বসল।

বিশ্বাস করো, আমি বেশ খোলা মন নিয়েই বেরিয়েছিলাম; কিন্তু একটা খুঁতখুঁতনি অধিকার করেই বসল মনটাকে। গাড়ি লেট হলে তেমন ক্ষতি হয় না, যদি সেই একই গাড়ি গন্তব্য স্থানে দেয় পৌঁছে। এ তো তা নয়। জংশন স্টেশন সমস্তিপুরে আমায় গাড়ি বদল করতে হবে; সেই গাড়ি আমায় নিয়ে যাবে পলেজাঘাট, পাটনার আর পার। মিস-কনেকশান হলে একটা বড় রকমের দুর্ভোগ আছে বরাতে সেটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না; কেননা পৌঁছোতে হবে রাত ন'টার জায়গায় একেবারে ভোর চারটেয়।

এ খুঁতখুঁতুনিটা কাটিয়ে উঠতে কিন্তু আমার বেশি সময় লাগল না। গাড়িটা শহরের এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে যেটুকু দেরি, তারপরই মনটা আস্তে আস্তে অন্য রাজ্যে প্রবেশ করল; যেখানে উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে আবাল্য পরিচিতি কতকগুলি দৃশ্য দেখবার জন্যে মনটা গাড়ির চেয়েও এগিয়ে ছুটতে থাকে। সেগুলো বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখা বলে কী যেন একটা মায়ায় জড়ানো। কত যেন আপন। মায়া-মোহের রহস্যটি বড় অদ্ভুত লাগে আমার। একেবারে যা কাছের, যা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজের, যা আমাদের জীবনে অনেকটা চিরন্তন, যেমন ধরো নিজের ঘর, নিজের শহর—এদের একটা মায়া থাকবেই; যা একেবারে দূরের,

যার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় শুভদৃষ্টির সঙ্গে ক্ষণিকেই যাবে মিলিয়ে, তারও একটা পেয়ে-না-পাওয়ার করুণ মায়া আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যা নিকটও নয়, দূরও নয়, যা মাঝখান থেকে নিকট দূরের, আপন-পরের সংযোগ ঘটাচ্ছে তার মায়ায় যেন একেবারে অন্য ধরনের মোহ লেগে থাকে। দ্বারভাঙ্গা থেকে সমস্তিপুর, এই-বাইশ-তেইশ মাইলের পথ, ঘরের সঙ্গে বাইরের এই সেতুবন্ধ আমার মনে সেই মোহ বিস্তার করে রয়েছে। যা দেখব তা বিশেষ কিছু নয়, তবু কেন আবার দেখার মধুর প্রত্যাশা লেগে থাকে বুঝে ওঠা যায় না—

শহর যেখানে শেষ হয়ে এল, শহরের মধ্যিখানের বড় রাস্তাটা একটা যেন দোল খেয়েই বাঁকের মুখে রেলপথটা যেখানে ডিঙিয়ে গেছে, তার ডানদিকের খানিকটা দূরে পাকা ঘাটবাঁধানো পুকুর, ঘাটের ওপর একটি বেশ উঁচু মন্দির। শহরে আসতে, শহর ছেড়ে বেরুতে এটি তোমার চোখে পড়বেই। আমি বেরিয়েছি প্রায় দুপুর হয়ে এল, কড়া রোদে মন্দিরের পিতলের চূড়া ঝলমল করছে। রাস্তাটা এবার রেল পেরিয়ে ডাইনে থেকে বাঁয়ে এসে পড়ে, ঘনসন্নিবিষ্ট সুপারি গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমাদের পাশে পাশে চলেছে। লোকের ভিড় এসেছে কমে।…তিনটি মেয়ের একটি ছোট দল, সবার কাঁখেই খালি ঝুড়ি। হয়তো শহরে ঘাস বেচতে এসেছিল, কিম্বা ঘুঁটে, তার সঙ্গে একটা হয়তো লাউ কিম্বা ছাঁচি কুমড়া—বেচাকেনা শেষ করে বাড়ি চলেছে। ত্রস্ত পদক্ষেপ, কেন দেরি হলো ওরাই জানে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুক্তকণ্ঠে গল্পের অবশ্য বিরাম নেই, প্রগলভ হাসিরও নেই অপ্রতুলতা।……একটা রিকশা ঘটা করে হর্ন দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, চালক একবার ঘুরে দেখে নিল, আরোহীও।……ময়লা কাপড়, হাতে একটা লাঠি, তার সঙ্গে এক জোড়া নাগরা জুতা, কাঁধে ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটা লম্বা পুলিন্দা, মাথায় ময়লা মুরেঠা। আসছে শহরের দিকে। মামলা-বাজ বলে ধরে নিতে বাধে না। খানিকটা দূরেই, তবু মুখের

প্রসন্নতায় স্পষ্ট বোঝা না গেলেও চলনে সেটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কেসটা নিশ্চয় ভালোই। কোন সাধু মহাত্মার ধুনির ছাইও বোধহয় মুরেঠার খুঁটে আছে বাঁধা।······মাইল দুয়েক গিয়ে রাস্তাটা আবার রেল পেরিয়ে বাঁ দিক থেকে ডাইনে এসে পড়ল। তার হাত কয়েক পরেই একটা নদী, আমাদের বাঘমতীই কি তার কোন শাখা আজ পর্যন্ত তার খোঁজ নেওয়া হল না; রেল লক্ষ্য করে সোজা চলে এসে হঠাৎ ঘুরে রাস্তার সঙ্গে সমান্তরালে বেরিয়ে গেছে। একটা খেয়ালী মেয়ে যেন আগে কি ভেবেছিল, তারপর হঠাৎ কি মনে হয়েছে, বদলে ফেলেছে মতটা। এদিকে রেল, ওদিকে নদী, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। জায়গাটাকে যদি ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যায় তো খুব বেশি ভুল হবে কি? ত্রিবেণী যে তিনটি জলধারা নিয়ে ছুটি জায়গাতেই বাঁধা থাকবে তার মানে কি? জীবনের শান্ত-চপল ধারা যে পথেই প্রবাহিত হয়ে যেখানেই মিলুক, যেখানেই বিচ্ছিন্ন হোক সেখানেই তো ত্রিবেণী—যুক্ত বা মুক্ত। এ পুণ্য সঙ্গম কি জগৎময় ছড়ানো নয়?

অন্তত আমি তো করে উঠলাম মুক্তি-স্নান। অবশ্য মনে মনেই। "মনসা মথুরা পুরম্" ঘুরে আসা আর কি। এগিয়ে চলল গাড়ি আমার ত্রিবেণী ছাড়িয়ে। উপরে নীচে অনন্ত বিস্তার। নিঃসীম নীল আকাশ দিকে দিকে দিকচক্রের সীমায় এসেছে নেমে। নীচে সেই মিলনরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত নূতন ধানের হরিৎ সমারোহ। দূরে কাছে বিচ্ছিন্ন গাছ; কোথাও নিঃসঙ্গ একটি, কোথাও একাধিক। অনেক দূরে কোথাও একটা পুরোপুরি বাগান; মাঝে মাঝে কুটীর. তাও একক বা একাধিক, সবই কিন্তু নূতন ধরনের ঢেউ খেলানো হরিৎ সমুদ্রে গা ডুবিয়ে রয়েছে। এই বিরাটত্বের মাঝখানে এসে আমি খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় গেল যাত্রাকালের আমার মনের সেই গ্লানিটুকু। মনটা এগিয়েই চলেছে, এর পরে আসবে বাঘমতীর ওপর লোহার পুলটা। তার রাঙা রঙটা ঝলমল করছে। এসে গেল একটা

গম্ভীর আওয়াজ তুলে, একটু বোধহয় সন্তর্পণেই আমাদের গাড়িটা পেরিয়ে চলেছে। নীচে শরতের বাঘমতীর অনুচ্ছ্বসিত প্রবাহ, আবিলতা অনেকটা গেছে ঘুচে, আকাশের নীলকে করেছে প্রতিফলিত। মাঝে মাঝে বালুচরের শুভ্র রেখা, তীরে কোথাও ফসল এসেছে নেমে, কোথাও কাশগুচ্ছ; শুভ্রশ্মশ্রু ধ্যানমৌন তপস্বীর দল।

হায়াঘাট স্টেশন এসে পড়ল। ওঠা-নামা যাওয়া আসা, ঠেলাঠেলি মনটাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে যাত্রা-অযাত্রার জগতে আনল আবার ফিরিয়ে।

হায়াঘাটের মাইলখানেক পরে আবার ঐরকম লোহার পুল। মনটা এখানে এসে আপনা হতেই যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ে। পুলের নীচে মরা নদী। কবে পূর্ণ প্রবাহে ছিল জানি না, তবে ছেলেবেলায় দেখেছি বর্ষায় এতে স্রোত বইত, কখনও কখনও বন্যার স্রোতও। আজ প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরে আর কিছুই নেই, মজে-আসা গহ্বরে এখানে ওখানে খানিকটা করে বর্ষার জল থাকে জমে, দু'দিকের ঢালুর তৃণাচ্ছদ, আশেপাশের চেয়ে একটু বেশি সবুজ।

আর দাঁড়িয়ে আছে দূরে উঁচু তীরের ওপর, পূর্বসমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তার আকাশ রেখা ভেদ করে একটি মন্দির, গ্রামের মাঝখানটিতে। নদীটা বারানসীর গঙ্গার মতোই যেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গেছে ঠিক সেইখানে গ্রামটা, গাড়ি থেকে এক নজরে সমস্তটুকু চোখে পড়ে।

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘর নিয়ে ছোট গ্রাম, একদিনের সমৃদ্ধিস্মৃতি নিয়ে মৌন ম্লান; জীবন যাত্রায় নদীর তো আর সে পূর্বের স্থান নেই। তবুও আমার মনের ছায়া গিয়ে পড়ে, দুটি অশ্রু ছলছল চোখ নিয়ে গ্রামটি যেন চেয়ে থাকে আমার দিকে।

আমার মনটাকে কিন্তু ভিজিয়ে তুলতে পারবে না। আলোয় ঝলমল মুক্ত আকাশের নীচে এই যে শুধুই এগিয়ে চলা, ভালো-মন্দকে দুপাশে ফেলে রেখে, এইটেই আমার কাছে এখন সবচেয়ে বড়

সত্য। পিছু ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় কোথায়? অনন্তকালের কৃপণ ভাণ্ডার থেকে গুটিকতক মুহূর্ত কত যুগের তপস্যায় পেয়েছো— তোমরা জীবনে শুধু এগিয়ে চলো, দেখে চলো। যতটুকু পেলে সঞ্চয় করে নিয়ে চলো, থমকে দাঁড়াবার সময় নেই……আর, দুঃখই বা কিসের? কীর্তিনাশার কূলেই তো নব নব কীর্তির জন্ম। এক জায়গার ধ্বংস আর এক জায়গায় সৃষ্টি হয়ে ফুটে ওঠে। সুন্দর মরে, কিন্তু সৌন্দর্যের তো মৃত্যু নেই; দেশে দেশে যুগে যুগে নিজেকে নব নব মনোহারিত্বে করেই চলেছে বিকশিত।

পেছনে বাঁকের মাঝে রাঙা পুলটা পড়ে রয়েছে। কোম্পানীর আমলে তৈরী। বি এন ডব্লিউ আর ছিল কিপ্‌টে, প্রতিটি পয়সা ছিল তার মা-বাপ, একটা লাইন পাততে পাঁচবার হিসেব করত। দুষ্টু নদী তাকে একটা দমকা খরচ করিয়ে সরে পড়েছে। ভালো, এইরকম একটু আধটু রসিকতা মাঝে মাঝে না হলে জীবন যে বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ে।……রাঙা পুলটা তার দুষ্টু ঠোঁটের রাঙা হাসির মতো রয়েছে জেগে।

আরও দুটি পুল, খুব কাছাকাছি। লোহার নয়; ইটের থামের ওপর রেল পাতা। ঠিক নদী বলতে কিছু নেই। সেরকম বেশি বন্যা নামলে, বাঘমতীর জল কূল ছাপিয়ে এ দুটির মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ধারায় বেরিয়ে যায়। সেই যে শহর থেকে বেরিয়ে নদী, তারপর এইরকম ছোটবড়, মাঝারি অনেকগুলি ধারা, অনেকগুলি বিল-জলা। সমস্তটাই বাঘমতীর এলাকা। বাঘমতী এখানটায় তার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে একটি যেন বিরাট সংসার পেতে বসেছে। আমাদের দ্বারভাঙ্গা জেলায় এই-রকম দুটি সংসার, পশ্চিমে বাঘমতী, উত্তর-পূর্বে কমলা। কেউই তেমন বড় নয়, কিন্তু অনেকগুলি নিয়ে ছা-পোষা। সবগুলির পেটে ভালোরকম রসদ জোগাতে পারে না। আহা!

গাড়ির কামরার মধ্যে একটা আশঙ্কাই সবার মূল আলোচনার

বিষয় হয়ে উঠেছে—জংশনে গিয়ে গাড়ি পাওয়া যাবে তো? আমার পাশের ভদ্রলোকটি আমায় কনুইয়ের ঠেলা দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। ভদ্রভাবেই, তবু ঠেলাটুকু যে কবার গুঁতোর মতোই হয়ে গেল তার জন্য বিশেষ ভ্রূক্ষেপ বা অনুশোচনা নেই। ব্যবসাদার মানুষ, যে কারণেই হোক একটু বেশী উদ্বিগ্ন।

"লেট্‌টা তুলে নিচ্ছে বাবু? ছেড়েছিল বললেন চল্লিশ মিনিট দেরি করে না?"

বললাম—"কই আর পারল এখন পর্যন্ত। মাঝখানে ক্রসিঙের জন্যে একটু বেড়েই গেল বরং।"

"বেড়ে গেল? এই সেরেছে! ক' মিনিট বাড়ল আবার? তা বাড়ল তো স্পীড্ বাড়াচ্ছে না কেন?...কয়লা বাঁচাচ্ছে বোধ হয়।"

বললাম—"খুব সম্ভব।"—ভাবলাম, ব্যবসাদার মানুষ, এ হিসেব-টাতেও যদি এটু স্বস্তি পান।

"কিন্তু ও গাড়ি ফেল করলে আমাদের কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন?"

"খুব সম্ভব নয়।"—বাইরের দিকেই দৃষ্টি রেখে উত্তরটা দিলাম। একটি ছোট ডোবায় গুটি কতক মহিষ আকণ্ঠ ডুবিয়ে ভেসে রয়েছে। কতকগুলি ছেলে-মেয়ের জলে হুল্লোড়বাজি, একটি ছেলে সাঁতরে একটা মহিষের পিঠে গিয়ে উঠল। তীর থেকে একটু তফাতে একটা নীচু বাবলা গাছের ডালে দুটি বক ঠোঁট সামনে করে এমন কৌতূহলী হয়ে বসেছে—যেন একটি উৎকৃষ্ট নাটক হচ্ছে আর তারা দর্শক।

একটু বিরতি গেল, তারপর আবার প্রশ্ন—

"আপনাকেও তো গাড়ি ধরতে হবে বলছিলেন?"

বললাম—হ্যাঁ।

একটু যেন বেশি লক্ষ্য ক'রে আড়চোখে মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন।

"কিন্তু কই, আপনি তেমন বিশেষ ভাবনায় রয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

এও এক জ্বালা; একজন ভাবছেন না বলে একজনের ভাবনা গেছে বেড়ে। এর উত্তর কি দিই?

"ভাবনার তেমন কিছু নেই মনে করেন?"

বললাম—"অন্তত ভেবে কোন ফল নেই এটুকু মনে করা চলে তো?"

একটু আবার বিরতি, তারপর—

"একথা ঠিক বলেছেন। আমি তো পাশার দান ফেলে দিলাম—এখন সুখ দেন, দুঃখ দেন, লাভ দেন, লোকসান দেন, সব বজরংবলীর ইচ্ছে।...ঠিক বলেছেন আপনি।

নিত্যদিনের ব্যবসায়ের Speculation এর সঙ্গে মিলে গেছে: হাত পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। সেই থেকে চুপ করেই আছেন।

কিষুণপুর মুক্তপুর পেরিয়ে গেল প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরিচিত দৃশ্যগুলির মধ্যে দিয়ে। গাড়িটা ঘাটতি কিছু তুলে নিয়েছে। মুক্তাপুর পেরিয়ে সমস্তিপুরের দিকে এগুলো। কিছু এগিয়ে গতি একটু মন্থর, একটা চড়াই ঠেলে উঠেছে, সামনে বুড়ী গণ্ডকীর পুল। আমি একটু গুছিয়ে বসলাম, যতটা পারি একটু ভাল ক'রে দেখে নিতে হবে।

নদী হিসেবে এই নদীটি আমার সব চেয়ে আত্মীয়; অন্য কোন নদীর সঙ্গেই এর মতো এতটা মেলামেশা হয়নি আমার। সময়টাও ছিল তেমনি, কলেজের যুগ। প্রথম যৌবন। গণ্ডকী আমার সেই প্রথম যৌবনের কতকগুলি অমূল্য দিনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। ওকে দেখলে আমি বদলে যাই।

আমরা পাণ্ডুল ছেড়ে আসার পর বাবা মজঃফরপুরের একটা গ্রামে একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ নিয়ে যান। গ্রামটার নাম মহম্মদপুর। ফ্যাক্টরী বলা ঠিক হয় না; এক সময় একটা নীলকুঠি ছিল, বাবা যখন

গেছেন তার অনেক আগে থেকেই রাসায়নিক নীল বের হওয়ায় নীলের কারবার গেছে উঠে ; কোম্পানী রকমারি চাষবাস নিয়ে আছে—বেশির ভাগ আখ। আমি ফ্যাক্টরী বলেই কিন্তু চালাই এখানে; সুবিধে হবে।

গ্রাম বলতে এখানে কিছুই নেই। ফ্যাক্টরীর আফিস প্রশস্ত চৌহদ্দির মধ্যে সাহেবের বাংলো; এতটুকু তফাতে, ওদের আভিজাত্য নিয়ে। খানিকটা সরে (আধ ফারলংও নয়) কর্মচারীদের কলোনী, বেশী নয়, জন দশবারো, কেউ পরিবার নিয়ে, কেউ এমনি। জায়গাটি কিন্তু বড় স্নিগ্ধ। কলেজের চারটে বছর আমার কাটে কলকাতা আর পাটনায়। গরমের ছুটিটা বাবার ওখানেই চলে যেতাম আমি। ছোট আর নিরিবিলি বলে জায়গাটা আরও লাগত স্নিগ্ধ। মহম্মদপুরের প্রধান আকর্ষণ ছিল—অন্তত আমার পক্ষে এই বুড়ী গণ্ডকী। বর্ষায় ওর বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একটা টানা বাঁধ ছিল কলোনীটার একেবারে গা ঘেঁসে। খুব উঁচু নয় এক কোমর; তার ওদিকে খানিকটা বাদ দিয়েই নদীটা এখানে প্রায় মাইল দুয়েক একেবারে সোজা পশ্চিম থেকে পুবের দিকে চলে গেছে। কলোনীর মাঝখান দিয়ে একটা কাঁচা সরকারী রাস্তা পুষা···মজঃফরপুরের পাকা সড়ক থেকে বেরিয়ে বাঁধটা ডিঙিয়ে নদীর কোলে নেবে গেছে, কলোনীর থেকে একশো গজও নয়। সেইখানে খেয়া ঘাটটা।

গণ্ডকীর ওপর আমার একটা পক্ষপাতিত্ব আছে স্বীকার করি, তবু এ-কথাটি নিতান্তই পক্ষপাত-দুষ্ট নয় যে ওর মতো অত স্বচ্ছ আর নীল জল আমি কোন নদীতে দেখিনি। আমি থাকতে থাকতেই শেষের দিকে বর্ষা নামত, নদীর জল ঘোলা হয়ে আসছে, এই সময়টা কলেজ খুলে যেতে আমি প্রায় চলে আসতাম মহম্মদপুর থেকে। সেই জন্যেই বোধ হয় স্বচ্ছ-সলিল রূপটিই শাশ্বত হয়ে আছে আমার মনে। অন্তত—মেনে নেওয়া শক্ত হলেও—অন্য সব নদীর চেয়ে গণ্ডকী যে কম দিনের জন্য ঘোলাটে থাকত একথাটা

খুবই সত্য; ও যেন অপরিচ্ছন্নতা বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারত না।

সকালে গিয়ে নদীতে পড়া আমার একটা ব্যসন ছিল। বিরল-বসতি জায়গা, ঘাটে কোন সময়েই ভীড় নেই, আমার সঙ্গী গণ্ডকী, গণ্ডকীর সঙ্গী আমি; একেবারে তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। একটু দূরেই হয়ত কেশের গুচ্ছের মত একরাশ শ্যাওলা স্রোতের টানে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে, আমি গা-ডুবিয়ে আছি বসে। খেয়াল হলো সাঁতরে এপার-ওপার করলাম কবার, মাঝে মাঝে জলমেপে। কোথাও বুক পর্যন্ত, কোথাও গলা ডোবে; একেবারে ডুব জল নিতান্তই কম। এই জন্যেই নদীটাকে—অন্তত এই খানটায় নিতান্তই খেলাঘরের নদী বলে মনে হতো, একটা নিঃশঙ্ক আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। একেবারে মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছি বুক পর্যন্ত জলে। পায়ের ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে নীচের বালি যাচ্ছে সরে সরে, একটু একটু করে যাচ্ছি নেমে। সে বড় এক অদ্ভুত অনুভূতি, কৌতুককর, —খেলার সাথীর কাতুকুতু খাওয়া। উঠতে ইচ্ছে হোত না জল থেকে; যখন উঠতাম, হাত পা একেবারে হেজে চুপসে গেছে।

বাবার আফিস থেকে আসতে দেরী হ'তো; নীলকুঠির টাইম, সকাল-বিকেল; দুপুর বেলা আমি কোন কোন দিন বাসায় শেকল তুলে দিয়ে ঘাটে গিয়ে বসতাম একটি বেশ বড় অশ্বত্থগাছের তলায়। লোকজন আরও কম। সামনে খানিকটা তফাতে ঘাটোয়ালের খড়ের কুটিরটা, একটা অশ্বত্থ গাছেরই নীচে। দেখবার মন নিয়ে বসেছ অথচ বিশেষ কিছু দেখবার নেই, এমন অবস্থায় যা সামান্য তাই অসামান্য হয়ে ওঠে। এই একটানা-বয়ে-যাওয়া নদী, ওপারে ঢালু বয়ে নেমে আসা অল্প সল্প বৈশাখী ফসল; যেখানে তাও নেই, ঘাসের আস্তরণ, তারও অভাবে চিকচিকে বালি, এপারে কুটিরের মধ্যে ঘাটোয়ালের ভাল করে মাজা পেতলের থালা আর ঘটির চকচকানি। আমাদের কলোনীর ফ্যাক্টরীর বাইরের একমাত্র প্রতিবেশীর বাড়ি

থেকে কেউ কলোনীতে নদীর জল নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল। বহুদূরে কোথায় একটা ঘুঘুর একটানা ডাক, মাথার ওপর অশ্বথের পাতাগুলি তাদের শীর্ণ বৃন্তে থরথর করে অবিরাম কেঁপে যাচ্ছে, পতপত করে একটা টানা শব্দ রয়েছে জেগে—কিছুই নয়, অথচ ওদের আকর্ষণে সুস্থ মস্তিষ্ক যুবক ঘর ছেড়ে মধ্যাহ্নের তাপ অগ্রাহ্য করে গিয়ে বসে থাকত কেন সেটা বুঝতে হলে তোমাকেও এরকম একটি মধ্যাহ্নে ঐরকম একটি পরিবেশ বেছে নিতে হবে। তুমি বলবে—ক্ষেমা দিন, ঢের হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়েই থাকতে দিন একটু। আমি বলব—দেখই তো একবার খুঁজে পেতে।

বিকেলে বেড়িয়ে এসেও বসতাম কখনও কখনও। দিনের তাপ অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। খেয়া একটু চঞ্চল, ঝুড়ি-ভরা ঘাস নিয়ে, কি বেসাতি-শূন্য ঝুড়ি নিয়ে এপারের লোক ওপারে যাচ্ছে; কি ওপারের লোক এপারে আসছে। বলদ-গাড়ি পারাপারের জন্য ঘাটে একটা ফ্লাট বাঁধা। তীরের ঢালু বেয়ে একটা গাড়ি নামল, গাড়োয়ান বলদ দুটোকে খুলে আগে একটু জল খাওয়াতে নিয়ে গেল। ঘাটোয়াল হাতের তেলোয় খইনি ঝাড়ার শব্দ ক'রে আস্তে আস্তে আসছে নেমে। মানুষের নৌকাটা যাত্রীরা নিজেরাই পারাপার করে; অত মেহনত ওর পোষায় না; ফ্ল্যাটের বেলা আসতেই হয় নেমে।

দিন শেষ হয়ে আসছে, পশ্চিম আকাশে রঙের তুলির টান। অশ্বথ গাছের মাথায় পাখিদের কলরব যাচ্ছে বেড়ে।

সেদিন বসে বসে কি মনে হতো ভালো করে স্মরণ নেই। ঠিক করে বলতে পারব না, তবে রবীন্দ্রকাব্য তখন তো পড়া হয়েছে কিছু কিছু, তারই একখানি টুকরা যেন মূর্তি ধরে উঠত আমার সামনে শিলাইদহের একটি কোণ।

গণ্ডকীর সঙ্গে ক্ষুধিত-পাষাণের কোন মিলই নেই তবুও ও আমায় অমোঘ আকর্ষণে টানত। টানত সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, ক্বচিৎ জ্যোৎস্নাপ্লুত স্তব্ধ রজনীতেও। ওর অভঙ্গ শান্তির অন্তরালে কি

কোনও অতলান্ত অতৃপ্তি রয়েছে, কোনও অনন্ত জিজ্ঞাসা, কোন অতন্দ্র অন্বেষণ? ওর অবিরাম স্রোতে কি থাকত তারই বেদন-কাকলি?

আমাদের গাড়িটা পুলের ওপর এসে পড়েছে। বহুদূরে বাঁ দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাদা-রং-করা পুলটা, পাশেই চিনির কল, মন্দির, তার ঘাট। পুল পেরিয়েই একেবারে লাইনের ধারে সাহেবদের কবরস্থান। ওদের শ্মশান তার শ্রী, তার শিল্পের আবেদন নিয়ে মৃত্যুকে ততটা যেন মনে করায় না, যতটা করায় জীবনকেই। দ্বারভাঙ্গায় যেটা আছে সেটাতে ছেলেবেলায় বেড়াতে যেতুম। কবরের মাথায় বড় বড় মার্শেল নীল গোলাপগুলোর ওপর ছিল লোভ। ওদের মৃত্যু-পুরীর দরজায় কি যমদূত পাহারা দেয় না? এঞ্জেলরা দাঁড়িয়ে থাকে মর্ত্যের শিশুকে অভিনন্দিত করবার জন্যে?

কবরস্থানের পাশ দিয়ে ঘুরে রেলটা স্টেশন-মুখী হ'ল। যাত্রার প্রথম দফা শেষ ক'রে সমস্তিপুরে এসে পড়লাম। মাত্র মাইল তেইশ, মাত্র ঘণ্টা তুই, কিন্তু পথে যা পেলাম, তা তো পেলামই, গণ্ডকীর পুণ্য দর্শনে আমার আয়ুষ্কালের ওপ্রান্তে শৈশব-যৌবনের দিনগুলো থেকে একটা দীর্ঘ সফর করে এলাম। তাই বলি, বেরিয়ে পড়, চল, এগিয়ে চল। বাইরে স্রোত, ঘরে তো চারিদিকের দেয়াল-বদ্ধ শুধুই আবর্ত; নিজেকে, নিজেরটুকুকে কেন্দ্র করে। স্রোত হয়ত তোমার মনের মত হয়ে, তোমার নির্দেশ মেনে সব সময় বইবে না। বাধা আসবে, সংঘাত আসবে; তবুও স্রোত মুক্তি, গতির বেগেই নিজেকে নিজে ঘষে-মেজে চিরনবীন ক'রে রাখে; বাধার মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় ক'রে, যত বাধা ততই হয়ে ওঠে তুর্বার।

সমস্তিপুরে গাড়ি থেকেই কুলিদের মুখে শোনা গেল, ও-গাড়িটাও লেট্। এখনও এসেই পৌছায় নি। কিছু তুলেও নিয়েছে আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনটা। সুতরাং এখন নিশ্চিন্দি। আমার পাশের যাত্রীটি ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে বললেন,—"আপনারা যাত্রা অযাত্রা বিশ্বাস

করেন না বাঙালীবাবু; এই দেখুন, হনুমানজীর ইচ্ছা, আমি পণ্ডিতজীকে পাঁজি দেখিয়ে বেরিয়েছি, যাবে কোথায় ?"

হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় একটা কথা জান না, সব হিন্দুর আবার যাত্রা-অযাত্রা এক নয়। এদিকে যে কথায় বলে বারো রাজপুতের তেরো হেঁসেল, (বারহ্ রাজপুত কী তেরহ্ পিঁঢ়ি) সেটা শুধু রাজপুত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, সামগ্রিকভাবে আসমুদ্র-হিমাচল সমস্ত হিন্দু জাতিটার পক্ষেই। (বাইরে আর আছেই বা কোথায়, বেঁচে থাক পাঁজি !) ওদের শনি ভাল মঙ্গল অমঙ্গল নয়, বৃহস্পতি তো যাত্রার রাজা। এখানকার কথা বলছি—জানি না কেরলে কি নিয়ম, কাশ্মীরে আবার কি।

ওঁকে বললাম—"হ্যাঁ, মানতে হয় বৈকি।'

আমার পাঁজি যে অদৃশ্য দেবতার হাতে তিনি নিশ্চয় একটু স্মিতহাস্য করলেন।

তাঁর ঘাড়েই বা সবটুকু চাপাই কেন ? সারা পথে একটা টাইমটেবিল পেলাম না যে কিভাবে যাচ্ছি, কখন পৌঁছাব তার একটা আন্দাজ পাই। দ্বারভাঙ্গায় পাইনি, সমস্তিপুরে পেলাম না, মজঃফরপুরে পাব না, সোনপুরেও নয়। সামান্য জিনিস কিন্তু পাওয়া যাবে না। অথচ মনে রেখো মাসটা হচ্ছে অক্টোবর; নূতন টাইমটেবিল সবেমাত্র বেরিয়েছে। অস্বীকার করব না, রেলে অনেক সুবিধা করে দিয়েছে আজকাল, শুধু সেই সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করতে করতে যাবে কিভাবে, পৌঁছাবে কখন তার হদিস জানার সহজতম উপায়টি তোমার করায়ত্ত নয়।...হাতের পাঁজিই নেই, অলক্ষ্য পঞ্জিকাকারকে দোষ দিয়ে হবে কি ? তাঁর বোধহয় একটু সুবিধা হলো, এইটুকুই বলা যায়।

কথাটা তুলতে হল এই জন্যে যে একখানি টাইম-টেবিল হাতে থাকলে আমার যাত্রার দ্বিতীয় পর্বটা যে-ভাবে কাটল সে-ভাবে কাটবার সম্ভাবনা (জানি না সেই অলক্ষ্য পঞ্জিকাকারের শক্তি কতটা) অন্তত অনেকখানিই কমে আসত।

অবশ্য অনেকগুলি কারণ একত্র হয়েছিল। প্রথমত আমি এই গাড়িটাতে আসি বড় কম, যার জন্যে এর সঙ্গে অন্য সব গাড়ির যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকবারই কথা। দ্বিতীয়ত ঐ টাইমটেবিলের অভাব থাকলে নিশ্চয় মিলিয়ে নিতামই একবার। তৃতীয় কারণের কথা তুলতে গিয়ে মানুষের মনের একটা অদ্ভুত প্রবণতার কথা এসে পড়ছে, তাই থেকেই বোধহয় (রাগ করো না) তোমাদের অতি—আধুনিক কবিতারও জন্ম। স্বীকার করবে নিশ্চয় —মানুষের ভাষা তার মনের ভাব প্রকাশ করতে এমনিই অনেকটা অক্ষম। তাই যদি হয় তো যেটুকু ক্ষমতা আছে তার সেটুকুর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে চেষ্টাই তো করব সাধ্যমতো মনের ভাবটা প্রকাশ করতে। কিন্তু তা না করে সেটাকে আরও ধোঁয়াটে করে তুলতেই ঐ জন্ম-পঙ্গু ভাষাকে কাজে লাগাই। কোথাও ছেড়ে কোথাও বাড়িয়ে কোথাও আবার এটার জায়গায় ওটা বসিয়ে। কুলি মোট তুলে প্রশ্ন করল কোথায় যাব। তাকে যদি সোজাসুজি একটিমাত্র শব্দে জানিয়ে দিই—'পাটনা' তো ল্যাটা চুকে যায়, তা না করে বললাম—"পশ্চিমকে তরফ।" দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে ?

তা বৈকি। আপাতত কাজ হোল বটে, ও আমায় "পুরুব" অর্থাৎ কলকাতার গাড়ি বাদ দিয়ে পশ্চিমের গাড়ির প্লাটফরমে নিয়ে গেল, কিন্তু এই কাজের মধ্যে অকাজের বীজ লুকিয়ে রইলই। সে-কথায় পরে আসছি।

ঘণ্টাখানেক পরে পশ্চিমের গাড়ি এসে উপস্থিত হল, উঠে বসলাম। গঙ্গার ওপারে গাড়িগুলোর তবু একটা চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস আছে, দেরি হয়ে গেলে সেটা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের এগুলো আরও যেন গা এলিয়ে দেয়। জানো তো এক ধরনের মেণ্টালিটি বা মনোভাব আছে। চলাফেরা শোওয়াবসায় এক কথায় সবরকম আচার ব্যবহারে খুব পাকা হতে হবে, নয় তো

একেবারেই কিছু হয়ে কাজ নেই; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। জয়গোপাল কাকার কথা মনে পড়ে গেল—

তার আগে একটা কথা বলে নিই, আমার যা ধারণা। কথাটা হচ্ছে যদি উগ্ররকম 'স্বদেশী' না হও তো নিশ্চয় বিশ্বাস করবে Punctuality জিনিসটা এদেশের মাটিতে ছিল না, ওর বীজটা পশ্চিমের হাওয়ায় উড়ে এসেছে, তারপর গজিয়েছে, বড় হয়েছে, শাখা বিস্তার করছে। তার সাক্ষী ছ্যাখো, ওর এককথায় ঠিক পরিভাষা নেই এত বিরাট বিস্তৃত সংস্কৃত ভাষায় (আছে কি?) আমরা গড়ে পিটে নিয়েছি 'সময়-নিষ্ঠা', 'সময়ানুবর্তিতা'। অন্য দিক দিয়েও ধরতে গেলে দেখবে এ বস্তুটির ঘড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ওটা ওদিকেরই আমদানি।......তুমি ফোঁস করে উঠবে, আমাদেরও তো ছিল, সূর্য ঘড়ি বা সান্‌ডয়েল। কিন্তু কটা? বুক পকেটে রেখে বা কব্জিতে বেঁধে সময় গেল সময় গেল বলে ঘুরে বেড়াবার মতো নয় তো।

আসলে গরম দেশের লোক আমরা, জীবনটাকে গ্রহণ করবার পদ্ধতিও অন্যরকম। ঠিক Punctuality বলতে যা বোঝায়—পেয়াদাজাতীয়,তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। তা বলে কি সময় সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া ছিলাম? তা কেন থাকব? ব্রাহ্মমুহূর্ত ছিল, গোধূলি ছিল, শুভ অশুভ কাজে লগ্ন বিচার ছিল। যতটা ধাতে সইত আর কি।

জয়গোপাল কাকার কথায় ফিরে আসা যাক। অর্থাৎ সেই মনোবৃত্তির কথা—একেবারে পাকা হও, নয়তো কিছুই হয়ে কাজ নেই। আমাদের এদিকের গাড়ির সেটা এত মেলে। উনি কাকা ছিলেন প্রতিবেশী হিসেবে, সরকারী কাকা। অনেকের বাবা-জ্যাঠার চেয়ে বড়, নয়তো এমনি উনি ছিলেন আমাদের স্কুলের থার্ড মাস্টার। সেকালের এফ্‌-এ পাশ (তোমাদের আই-এ)। অত্যন্ত কড়া লোক, আর তার সঙ্গে পাংচুয়ালিটি।

প্রথম পিরিয়ডে কাকা নিতেন আমাদের অঙ্ক। অঙ্কেরই শিক্ষক ছিলেন (অন্যথা মিনিট-সেকেণ্ডের এত কড়াক্কড়ি থাকতও না) কিন্তু ওপরের তিনটে ক্লাসের প্রবন্ধও উনি নিজের হাতে রাখতেন, হয়তো পাছে পাংচুয়ালিটির প্রবন্ধ বাদ পড়ে যায়, কিম্বা কারুর কোন ত্রুটি থেকে যায়।

ক্লাসে ঠিক দুমিনিট আগে ঢুকতেন জয়গোপাল কাকা। রোলকলের খাতাটা সামনে খুলে রাখতেন, তারপর পকেট থেকে রূপার চেন সুদ্ধ ঘড়িটা বের করে সামনে রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন, তারপর যেই ওদিকে ঘণ্টা বাজা…

তার আগে আর একটা কথা বলে নিই। ঐ একটা বাতিকই বল বা যাই বল, এদিকে কাকা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, যেমন অঙ্কে আর ইংরাজীতে গভীর জ্ঞান, তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা। তা ভিন্ন হেডমাস্টার থেকে নিয়ে কয়েকজন শিক্ষকই ছাত্র, আর কিছু যত হোক না হোক অন্তত সময় বিষয়ে তাঁর অনুশাসনটা নিখুঁতভাবে চলত স্কুলে।

ঘণ্টা বাজার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলেন—প্রিয়তোষ সান্ন্যাল!…ঐ ছিল আমাদের ফার্স্ট বয়। চলল রোলকলের পালা।

সব কাজ নিখুঁতভাবে করবার অভ্যাস ছিল বলে একটু সময় নিত বেশি। হয়তো দশবারোটা নাম ডাকা হয়ে গেছে—তিন নম্বরের হরকালী এসে কাঁচুমাচু হয়ে প্রবেশ করল। কিছু বলতেন না, একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে গলা বাড়িয়ে খাতার ওদিকে ঘড়িটা দেখে নিলেন, তারপর আবার এগিয়ে চললেন। ইতিমধ্যে হরকালী খাতাপত্র রেখে আস্তে আস্তে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোন জবাবদিহিই খাটত না সুতরাং অযথা বাক্যব্যয়ে দরকার হত না।

হয়তো আধাআধি গিয়েছেন, বলাই এল। ঐকথা। আরও

খানিকটা এগুতে এল নগেন, খানিক পরে এল শম্ভু। নিঃসাড়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে, অভঙ্গ স্তব্ধতার মধ্যে। একে একে উঠে দাঁড়াচ্ছে বেঞ্চে সবাই।

জয়গোপাল কাকার ক্লাসে চার পাঁচজনের বেশি লেট্ হোত না দৈনিক। তাও ঐ রোলকলের ছ' মিনিটের মধ্যে (ছ' মিনিটই লাগত) এর পরও যার দেরি হয়ে যেত সে আর আসতোই না। লজ্জা নয়, ঢোকবার হুকুম ছিল না। তার মানে ছুমিনিটের অতিরিক্ত অপরাধীর আর সাজা ছিল না জয়গোপাল কাকার পেনাল কোডে। সবটুকু বলি।

ঐ যে হরকালী গিয়ে আস্তে আস্তে বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল, তারপর বলাই, তারপর নগেন তারপর শম্ভু ওটা একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অঙ্গ। হরকালী এসেছিল এক মিনিট লেট্ সে এক পিরিয়াড দাঁড়াবে। বলাই দু' মিনিট, সে দু' পিরিয়াড, নগেন চার মিনিট সে চার পিরিয়াড. শম্ভু ডাক শেষ হওয়ার সঙ্গে, তার মেয়াদ পুরো-পুরি ছ' পিরিয়াড, অর্থাৎ স্কুলভোর। ছ'টি পিরিয়াডই ছিল আমাদের সময়; এত, সাব্জেক্ট ছিল না তো তখন।

বলবে, কেন, তারপরেও তো আটকে রাখবার নিয়ম আছে।

যতদূর মনে পড়ছে, ওটা তোমাদের একালেরই 'অনিয়ম'; আমাদের সময় ছিল না। অন্তত এটা ঠিক যে জয়গোপাল কাকা কখনও ওরকম করতেন না। কথাটা হচ্ছে, আটকে রাখলেই তো পরে আবার ওদিকে পাংচুয়ালিটির ওপর ধাক্কা খাওয়া, খেলায়, বেড়ানয়। চোখের আড়ালে যে ছেলেরা সব ঠিক রেখে চলবেই এমন কথা নয়; তবু, মাঝখান থেকে উনি প্রত্যবায়ী হতে যান কেন?

না, ফাঁকি দেওয়ার জো ছিল না। এমনি তো থার্ড মাস্টারের দেওয়া সাজা এড়িয়ে যাবে এমন বুকের পাটাই ছিল না কোন ছেলের তার ওপর পাকা রকম ব্যবস্থাও ছিল। এক ইঞ্চি চওড়া আর দেড় ইঞ্চি লম্বা সাদা চিরকুটের প্যাড থাকত একটা। রোলকল শেষ

হয়ে গেলে দেরাজ খুলে সেটা বের করে নিয়ে প্রত্যেক অপরাধীর নাম আর সাজার পরিমাণ লিখে তার হাতে দিয়ে দিতেন, অর্থাৎ যাদের এক পিরিয়াডের বেশি সাজা হোত। সে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের দস্তখত নিয়ে পরের দিন জমা দিত। অর্থাৎ সাজা যা প্রাপ্য পেয়ে গেছে।

স্কুলের বাইরেও রেহাই ছিল না। অবশ্য সবার নয়, যারা ওঁর হাতের কাছে ছিল। ওঁর বাড়ির কাছাকাছি গুটি পাঁচেক বাড়িতে আমরা তখন জন তেরো স্কুলের ছেলে রয়েছি। তাদের ওপর দৃষ্টিটা খুব সতর্ক ছিল। শহরের মধ্যে কোন সভা সমিতি হলে আমাদের উপস্থিত থাকতে হতো; যে ধরনের সভাই হোক না কেন—খেলা-ধূলা, সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনীতিক, ধর্ম-সংক্রান্ত, কিছুই বাদ যাওয়ার জো ছিল না। ছেলে রয়েছে সব ক্লাসের, একেবারে নীচের দিকেরই বেশি (আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে), কিন্তু কী বুঝলাম না বা বুঝলাম সেটা তো আদৌ কোন কথা নয়, কথাটা হচ্ছে ঠিক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হচ্ছি কি না। তখন ইংরাজের রাজত্বের স্বুবর্ণ যুগ। একটু উঁচু গোছের সভাসমিতি হলে, বিশেষ করে খেলাধূলা, সামাজিক বা কৃষ্টিগত, বড় কর্তাদেরই পৌরোহিত্য করতে ডাকা হোত, যেমন ধরো জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা সদরালা বা সিনিয়ার ডেপুটি—আরম্ভের সময়টা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করা হত। ওঁরা যেখানে থাকতেন না সেখানেও প্রায় তাই; হাওয়াটাই মোটামুটি ঐ রকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তখনকার দিনে।

ব্যতিক্রম হতো বৈকি।

মনে আছে একবার একটা ধর্মসংক্রান্ত সভা হচ্ছিল। কাশী থেকে কে একজন পরিব্রাজক মহাত্মা আসছেন। দুমিনিট চার মিনিট করে তখন আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। জয়গোপাল কাকা হঠাৎ একবার বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বের করে নিয়ে দেখে (দেখছিলেনই ঘনঘন) চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, আমরা পাশেই শতরঞ্জিতে

বসেছিলাম, তর্জনীটা বেঁকিয়ে বললেন—"গেট্ আপ"…হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি উনি আগে, আমরা সারবন্দী হয়ে পেছনে, যখন বাইরের বারান্দায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে নামব, পরিব্রাজক মহাত্মা ঘোড়ার গাড়ি করে এসে নামলেন। উদ্যোক্তাদের কয়েকজন দাঁড়িয়েই ছিলেন ওঁর অভ্যর্থনার জন্য, একজন মাস্টারমশাইকে বললেন,—"স্যার, চললেন আপনি? এসেই তো গেছেন মহাত্মাজী।"

চিত্রটি বেশ মনে আছে। জয়গোপাল কাকা একবার কটাক্ষে মহাত্মাজীর দিকে চেয়ে নিয়ে ওঁকে উত্তর দিলেন—"আমি আমার ছেলেদের নষ্ট করতে আনিনি এখানে।"…নেমে গেলাম সবাই ড্রিলের ভঙ্গিতে একে একে।

এর সামনে অন্যভাবে নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন উদয় হতো না; অবশ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের নীচে থেকে সম্ভাবনাও অল্প ছিল তার। সে সময় সিনেমা ছিল না। তবে যাযাবর পার্শী থিয়েটার একটা আসত একবার করে বছরে, মাসখানেক করে থেকে আবার চলে যেত। তাদের সত্যিকার অভিনেত্রীও থাকত, নাচ গানও খুব রুচিসম্মতও হতো না, তবু জয়গোপাল কাকা, অন্তত বার দুই আমাদের সবাইকে যেতেনই নিয়ে।

তারা অত্যন্ত পাংচুয়ালী আরম্ভ করত।

কৌতুক বোধ করছ তো করো, কিন্তু বিদ্রূপের ভাবটা এনোনা মনে সেই আদর্শ পুরুষের কথা শুনে। হয়তো একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আদর্শ নয়, অর্থাৎ পারফেক্টকে যে হিসাবে আদর্শ বলা যায় হয়তো একটু আনব্যালেনস্‌ড বা ভারসাম্যরহিতই, তবুও কি এঁদের ব্যক্তিত্বের মূল্য নির্ধারণ করা যায়?

সে যুগে প্রায় সব জায়গায় এইরকম করে এক আধজন থাকতেন। হেরম্ব মৈত্রেয়র সম্বন্ধে সেই গল্পটা শুনেছ তো? অবশ্য, জানি না সত্যি কি কপোল-কল্পিত। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কলেজ থেকে ফিরে—

একজন প্রশ্ন করল··· মশাই ষ্টার থিয়েটারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল, এদিকে ব্রাহ্মসমাজের নামজাদা আচার্য, বেশ বিরক্ত হয়েই উত্তর করলেন—"না, জানি না।"

খানিক যেতে না যেতেই গোলযোগ আরম্ভ হলো মনে। ঐ যাঃ মিছে কথা বলা হোল না?

ভাবতে ভাবতেই খানিকটা এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু ফিরতেই হোল—হাত তুলে ডাকতে ডাকতে—"ওহে শোন, শোন।"

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটি, কাছে এলেন। বললেন—"জানি, কিন্তু বলব না।"

হালকা মনে গটগট করে ফিরে গেলেন।

আনব্যালেনস্‌ড্‌ বলতে হয় বলো। আমি ঠিক তা বলি না। আমি বলি সদা-ধ্যানস্থ সদা-আত্মস্থ পুরুষ; একটা আদর্শের পেছনে কতখানি যে ছুটে এসেছেন, হুঁশ নেই।

তোমাদের কথা ধরলেও, এই আনব্যালেনস্‌ড্‌ পুরুষেরাই তখন-কার দিনের নৈতিক ব্যাল্যান্সটা রক্ষা করে যেতেন।

এখনও শেষ হয় নি জয়গোপাল কাকার পাঙ্ক্চুয়ালিটির কথা।

কাকার মনটা ছিল ভুলো, খুঁতখুঁতে মানুষের সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। বিশেষ করে কোথাও যাওয়ার সময়। কতটা দূর, ঠিক কখন বেরুলে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় পৌছানো যাবে, সেদিকে মনটা পড়ে থাকায় কিছু কিছু ভুল হয়ে যেত কখনও কখনও।

একবারের কথা বেশ মনে আছে। উপলক্ষটা প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌সের ভারত ভ্রমণ, কি কোন রাজারই অভিষেক ঠিক মনে পড়ছে না তবে সভাটা খুবই বড়, হোমরা চোমরা কারুর আসতে বাকি নেই। স্কুলের দিক থেকে ছেলেদের যাওয়ার সাধারণ ব্যবস্থা ছিল, ড্রিল মাস্টারের তত্ত্বাবধানে; কিন্তু উপলক্ষটা নাকি খুবই বড়ো, সময়-নিষ্ঠা পালন করবার এমন সুযোগ অল্পই আসে, তাই জয়গোপাল কাকা

আমাদের ক'জনকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন। একটা কথা বলা হয়নি; বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার বিভিন্ন রকম সময় বাঁধা ছিল কাকার। সভাসমিতিতে দশ মিনিট আগে, স্কুলে আট মিনিট, স্টেশনে পনেরো মিনিট—এইরকম। —এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কাকাকে। পায়ে বার্নিশ করা সেকালের স্প্রিং-দেওয়া চীনা-বাড়ির জুতো, সাদা মোজা, কামিজের ওপর ধবধবে সাদা থান কাপড়, কাল চীনা কোট, শুধু গলায় বোতামটা লাগান, বুকে রুপোর ঘড়ির-চেন। কাকার শরীরটা ছিল একটু স্থূল। সময়নিষ্ঠা সম্বন্ধে খুব বড় রকম একটা ছাপ রেখে দিতে পারবেন সবার মনে ভেবে মনটা গম্ভীর থমথমে হয়ে রয়েছে। সবাই এসে গেছি আমরা, বাইরের বারান্দায় নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ওঁর তামাক খাওয়া হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন ঘরের মধ্যে আর ঘড়ি দেখছেন। পোয়াটাক পথ। ঠিক হয়েছে, ওদিকে দশ মিনিট হাতে রেখে আমরা বার মিনিট আগে বেরুব। অর্থাৎ বারো আর দশ বাইশ মিনিট।

ঘরে একটা দেওয়াল-ঘড়ি রয়েছে আমরা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সেইদিকে দেখছি। যখন দু' মিনিট বাকি টেবিলে একটা খাম ঢাকা এক গ্লাস জল ছিল খামটা পাশের বইয়ের গাদার ওপর রেখে কাকা জলটা খেয়ে নিলেন। তারপর গেলাসটা রেখে পকেট কটার সব ঠিক আছে কিনা বুকে আর পাশে চেপে একবার দেখে নিতে গিয়েই তাঁর মুখটা শুকিয়ে গেল।

পকেটে হাত দুটো চাপতে চাপতে হন হন করে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন; আমরা সবাই পেছনে পেছনে। কিছু একটা ভুল হয়েছে নিতে, একেবারে বেরুবার মুখে আমরাও নার্ভাস্ হয়ে পড়েছি। ওঁর ঘরটা ওপরে, উঠতে উঠতে বললেন—"কার্ডটা কোথায় রাখলাম জানো?"

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, যে জামা ছেড়ে পাটভাঙা জামা

পরেছেন তার পকেট থেকে আরম্ভ করে বালিসের তলা, আলমারি, র‍্যাক্ সর্বত্র। কাকিমা নীচে কোথায় ছিলেন, সাড়া পেয়ে উঠে এলেন।

"কি ব্যাপার? যাওনি তোমরা এখনও?"

"কার্ডটা..."

"কার্ট্? কার্ট্ তো জলের গেলাসের ওপর রেখে এলুম, ঢাকা দিয়ে। ছাড়া কামিজটার পকেটে ফেলে গেছলে, পাওনি?"

আমাদের মধ্যে একজন নীচে ছুটে যাচ্ছিল, কাকা বললেন—"ওয়েট্"

সে থেমে যেতে, কাকিমা প্রশ্ন করলেন,—"কেন, যাবে না?"

"ওকে থামতে বলেই ঘড়িটা টেনে বের করেছেন কাকা; ম্লান হেসে বললেন—বারো মিনিটের সাত মিনিট হয়ে গেছে।"

একটি ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। কাকিমার ধাত জানা, জানেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও আর যাওয়াতে পারবেন না, আর ওকথা না তুলে বললেন—"তা ছেলেগুলোকে যেতে দাও। এমন একটা মিটিং চারিদিককার লোক ভেঙে পড়েছে। সবাই কি ঘড়ি ধরেই আসছে? না, সাত মিনিট পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

এইটুকুর মধ্যে যা ধরা রইল, শ্লেষই বল বা মনের বিরক্তিই বল।

কাকা চেয়ারে গাটা এলিয়ে দিলেন, আমাদের দিকে চেয়ে ম্লান কণ্ঠে টেনে টেনে বললেন—"যা—তোরা—ইচ্ছে হয়তো—তবে..."

কী ভেবে যে 'তবে' বলে টেনে ছেড়ে দিলেন, গিয়ে সব্বাইকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বসতে বললেন কি, অন্য কিছু তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

কাকিমাকে বললেন—"নীচে থেকে গড়গড়াটা নিয়ে আসুক, আর একছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আসতে বলো।"

কাকা চেয়ারের পিঠে মাথাটা উল্টে দিলেন।

আমাদের গাড়ির কথা বলছি ; এক ঘণ্টা দেরি করে এসে নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। জয়গোপাল কাকার মতন—যখন একটু গেল, একটু খুঁৎই রয়ে গেল, তখন আর কেন, সমস্তটাই যাক্। জেনেশুনেই অযাত্রায় বেরিয়েছি, অদৃষ্টকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ, তাই ঠিক করে আছি মনের জোরটা কোনমতেই কমতে দেওয়া হবে না। এক একটা ধাক্কা আসছে আর আশার প্রদীপটা উস্কে উস্কে দিচ্ছি। এখানে তো আধ ঘণ্টা স্টপেজ, খানিকটা নেবেই বাঁচিয়ে, তারপর পথও অনেকখানি, সোনাপুরের আগে অতিরিক্ত সময় দেওয়া আছে টাইম টেবিলে। ঘাটে যেতে যেতে সবটুকু না পারুক, অনেকখানি তুলে নিতে পারবে। রাত আটটায় ওপারে নামিয়ে দেওয়ার কথা, না হয় হলো আর একটু দেরি। আর উপায়ই বা কি ?

তুমি বোধহয় অতিরিক্ত সময় দেওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। তাহলে একটু গোড়া থেকেই বলি—

গল্পটুকু তুমি হয়তো জানতেও পার। ঠিক গল্প নয়, এটাকে বলা যায় চুটকি, গাড়ির এধরনের অব্যবস্থা নিয়ে। বেশ চালু কিন্তু। আমি পড়েছিলাম একটা ইংরেজী কাগজে। জানতো ওদের যত তামাশা আইরীশ আর স্কটদের নিয়ে, এরা নাকি জাত কেপ্পন, ওরা নাকি দারুণ অব্যবস্থিত।

আয়ারল্যাণ্ডের একটা স্টেশন। যাত্রী ভদ্রলোক টিকিট কাটিয়ে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়েই ওয়েটিং রুমে বসতে যাচ্ছিলেন, গাড়ি তো নিজের মর্জিতে যখন খুশি আসবে, দেখেন ডিস্‌টেন্ট সিগন্যালের কাছে এসেই গেছে গাড়িটা।

স্টেশন মাস্টারকে অভিনন্দিত করলেন—

"বাঃ, আপনার গাড়ি দেখছি একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসে উপস্থিত।"

"আজ্ঞে, এটা কালকের গাড়ি।"—বিনীতভাবে উত্তর করলেন স্টেশন মাস্টার।

—অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় চব্বিশ ঘণ্টা লেট।

হাতে গাড়ির ব্যবস্থা নেওয়ার পর থেকে যেভাবে দ্রুত ঘোরালো হয়ে আসছিল এই "লেট"-এর ব্যাপারটা তাতে আমাদের রেল-কর্তৃপক্ষের হয়তো আশঙ্কা হয়ে থাকবে, অবস্থাটা এইরকম পুরোপুরি চব্বিশ ঘণ্টায় গিয়ে না দাঁড়ায়। তাই, কবে থেকে জানি না, টাইম টেবিলে Extra অর্থাৎ অতিরিক্ত সময় গুঁজে দেওয়া হয়েছে মাঝে মাঝে। যেমন ধরো স্টেশন 'ক' থেকে স্টেশন 'খ' মাইল তিনেকের রাস্তা, মেরে কেটে দশ মিনিট নেওয়ার কথা। সময় কিন্তু দেওয়া আছে বোধ হয় আধ ঘণ্টা।……ব্যবস্থার অবশ্য খুব নিন্দে করা যায় না। যন্ত্র নিয়ে কারবার, বিগড়োতে কতক্ষণ?—সে হিসাবে খানিকটা হাতে রাখা মন্দ নয় হয় তো। দুঃখ এই যে এ-সত্ত্বেও এই 'চব্বিশ ঘণ্টার' দিকেই গতি। কিন্তু দুষবই বা কাকে? একটা যেন দুষ্ট চক্র দাঁড়িয়ে গেছে—Vicious Circle, কাউকে ছিন্ন করতে হবে তো সেটা? কিন্তু করে কে? সবই তো ঘুরছে চক্রটার মধ্যে পাক খেয়ে।

থাক ওসব কথা। যখন এখানকার পাওনা ঐ আধঘণ্টা ছাপিয়ে চল্লিশ মিনিটে দাঁড়িয়ে গেছে, নিতান্ত ছটফটানি ধরলে নেমে পড়তে হলো গাড়ি থেকে। না, না মোটঘাট নিয়ে নয়; অত অভিমান এ-লাইনে চলে না। নেমে গেলাম, দেখিতো গলদটা কোথায়—গার্ডের এলাকায়, না, ড্রাইভার সাহেবের। গার্ড সাহেবকে পেছন দিকে দেখতে না পেয়ে ইঞ্জিনের দিকে এগুলাম। দেখি দুজনে ঘেঁষাঘেষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছন থেকে অতটা বুঝতে পারি নি, এগিয়ে দেখি ড্রাইভার সাহেব দেশলাই জ্বেলে গার্ড সাহেবের মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। কি গল্প হচ্ছে, বোধ হয় হাসির গল্পই কোন—যে কুলিটা "লাইন ক্লিয়ার" নিয়ে এসেছে, সে সেটা হাতে করে কৌতুকের সঙ্গে শুনছে।

ছেলেবেলা থেকে এ গাড়িতে চলাফেরা করে, ধৈর্যের অভাব বড়

একটা হয় না। ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলাম—আর কতটা দেরি হবে কেউ বলতে পারেন আপনারা ?”

ঠিক উত্তর কারুর কাছে পাওয়া যায় না, কিম্বা হয়তো অনধিকার চর্চা মনে করে দিতেই চায় না সচরাচর। বোধ হয় হাসির গল্প চলছিল বলেই মনটা প্রসন্ন ছিল, গার্ড সাহেব বললেন—ঘাবড়াইয়ে মৎ, ফৌরন খুলতি হায় অর্থাৎ ঘাবড়াবেন না, এক্ষুনি খুলছে।”

“বাৎ কেয়া হুায় ?”—সদয় সহানুভূতি পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম।

শুনলাম—সামনের স্টেশনে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, “কণ্ট্রোল” অতটা নাকি আন্দাজ করতে পারেনি। এটার বদলে সেইটাকেই আগে ছেড়ে দিয়েছে। ডবল লাইন তো নয়, সেটা না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত এটা ছাড়তে পারা যাচ্ছে না।

হায়রে “কণ্ট্রোল” তুমি চালে-গমে-কাপড়ে-সিমেণ্টে ঢুকলে ঐ অবস্থা। স্টেশনে ঢুকলে ঐ অবস্থা ; আর কোথায় ঢুকবে বলে যে মুখিয়ে আছ তাই ভেবে ভয়ে গুটিয়ে আসছি।

মালগাড়ি ধিকুতে ধিকুতে আসছে তার নিজের চালে। যেটা ছিল এক ঘণ্টা সেটা দেড় ঘণ্টা করে নিয়ে গাড়ি ছাড়ল আমাদের। দাবা খেলতে বসেছি অদৃষ্টের সঙ্গে, সে যেন মুচকি হেসে একটা মোক্ষম ঘুঁটি সামনে ঠেলে দিলে। মুচকি হেসেই আরও একটা মারাত্মক চাল সে এর আগেই টিপে দিয়েছিল, সেটা টের পেলাম অনেক পরে।

গাড়িটা আসতে উঠে গিয়ে গোছগাছ করে বসেছি, ডিউটির পোশাকে রমেশ এসে উপস্থিত। আমাদের আত্মীয় এবং এখানকার সহকারী স্টেশন মাস্টার হয়ে রয়েছে বছর দুই থেকে।

এবারে দেখলাম আমায় দেখে ওর মুখটা বেশি রকম দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বললাম—“উঠে এস, খবর ভালো তো সব ? তোমার এখন এই শিফ্‌টে ডিউটি চলেছে ?” উঠে এসে আমার সামনা-সামনি বসল।

খবরটা খুবই ভাল, অপ্রত্যাশিত রূপে। কয়েকদিন হল সহকারী থেকে খোদ স্টেশন মাস্টারের ডিউটি পেয়েছে। ব্যাপারটা জানতাম লালফিতার জটিলতার মধ্যে চাপা পড়ে আছে, আশাও কম, সহায়-সম্বল তো নেই কিছু হঠাৎ এই অর্ডারটা বেরিয়েছে।...বাড়ি থেকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এমন একটা জঁাদরেল খবর, অথচ বলতে হবে যাত্রা ঠিক হয়নি।

স্বভাবতই ঐ আলোচনাই চলল আমাদের। কেমন করে ফাইল চাপা পড়ে গিয়েছিল, কাদের কারসাজি, তার মধ্যে থেকে কি করে উদ্ধার হল। তারপর ভবিষ্যৎ। এই যে একটা নূতন পথ খুলল, এর গতি কোন দিকে? এটা আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা, তার পর স্থায়ীটা কি আকারে দেখা দেবে।

নূতন দায়িত্ব, ওকে নেমে যেতে হলো শীঘ্র।

এধরনের ব্যাপারকে কি বলা যায়? এত নিবিড় আনন্দ, আর তাই নিয়ে ঐ-টুকুর মধ্যে এমন যতি-বিরতিহীন নিশ্ছিদ্র আলোচনা হলো আমাদের যে, ঐ সময়ের নিতান্ত দুটো দরকারী কথা (আর নিতান্তই স্বাভাবিক) একেবারেই বাদ পড়ে গেল: ও আমায় জিজ্ঞেস করবে—হঠাৎ যাচ্ছি কোথায়? একটা প্রশ্ন যা কেউই এমন হঠাৎ সাক্ষাতে না করে পারেনি এর আগে। আমি জবাব দেব—"পাটনায়।" তা হলো না।

মিলিয়ে দেখেছি—তা হয়ই না প্রায়।

আসল কথা কি জান? এই বিরাট বিশ্বনাট্যের রচয়িতা—The Greatest of playwrights—তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী তো আর হতে নেই। কি করলে effect অর্থাৎ প্রভাবটা ঠিক কি ভাবে ফুটবে, পরিণামটা কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা তাঁর চেয়ে বেশি করে কে জানে বলো। তাই তিনি এত বিরোধ-বিলাসী Fond of Contrasts। সুখকে নিবিড় ভাবে ফোটাবার জন্যে এনে ফেলেন তীব্র ব্যথা—The darkest hour before the dawn; তেমনি আবার

দুঃখ নিরাশাকে ফোটাবার জন্যে এনে ফেলেন সুখের মায়া। কাগজটা দুগ্ধ ফেনের মতো শুভ্র না হোলে খুলবে কেন কালির আচড় !

দুঃখ-দুর্ভাবনা সব মন থেকে ঝরে গেছে ; সুখবরের এই সুখটুকু নিয়ে বেরুনো গেল সমস্তিপুরের স্টেশন ছেড়ে। ছোট শহর, গাড়ি সেটাকে পেছনে ফেলে আসতে মনটা দুধারের মাঠে দিলাম ছড়িয়ে। ঠিক নিজ্ মিথিলা বলতে যা বোঝায় সে জায়গা ছেড়ে আমরা ক্রমেই দূরে গিয়ে পড়ছি। এদিককার জমি খুব উর্বর নয়। অন্তত আমাদের ওদিকের মতো নয়। ফসল আছে, এই কদিন মাত্র হল বর্ষা গেছে, আর বর্ষাটা ছিলও ভাল এবারে, তবু মাঝে মাঝে খালি জায়গা আছে পড়ে। কোনটা থেকে হয়তো সদ্য কোন ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে। কোনটা একেবারেই বন্ধ্যা। মনটা প্রফুল্ল থাকলে সবকিছুরই ওপর তার আলো এসে পড়ে। এই যে হরিৎ-বিহীন উষরতা এটাও আমার লাগছে বড় মিষ্ট। মন বলছে—নিত্য-প্রসূতির মতো ধরিত্রী শুধু ফসল নিয়েই যাবে, তার অবসর থাকবে না কোনখানে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার এই বা কেমন কথা !....এর উপর বোধ হয় salt-peter বা সোরার সংমিশ্রণ বেশি থাকায় এদিককার মাটি বেশ সাদাটে। তাইতে আমার দুদিকে যে দৃশ্যাবলী গাড়ির বেগের সঙ্গে দ্রুত এসে দ্রুত বিলান হয়ে যাচ্ছে তাতে চমৎকার একটি অভিনবত্বই এনে দিয়েছে—ওপরে আর নীচে চমৎকার একটি মিল, তফাতের মধ্যে ওপরে অর্থাৎ শরতের আকাশে নীলের পাশে সাদা, নীচে সবুজের পাশে পাশে। উভয়ত্রই মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো পড়েছে ঠিকরে। মনটা এত ভাল আছে যে অমন যে গাড়ি সেটাকেও ক্ষমা করতে পারছি। গতিবেগটা বাড়িয়েও দিয়েছে, গতির হিল্লোলে আমার প্রসন্ন ক্ষমাশীল মন থেকে সব গ্লানি যেন ঝরে গিয়ে মনটাকে আরও স্বচ্ছ করে দিচ্ছে।

এমন কি, গতিটা হঠাৎ নিরুদ্ধ হয়ে যেতেও তাতে বিশেষ ইতর বিশেষ হল না···চেন টেনে দিয়েছে কে।

এই এক ব্যাপার। এদিককার মতো নির্বিচারে চেন টেনে দিয়ে খেয়াল খুশিমতো গাড়ি থামিয়ে দেওয়ার হিড়িক আর কুত্রাপি দেখলাম না। সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। সর্বত্র কণ্টোল, শুধু এটাকে আনা গেল না কণ্টোলের আওতায়। একবার কিউল থেকে পাটনার মধ্যে সাতবার এই দুর্বিপাক। চেন টানে, নির্বিকারভাবে নেমে চলে যায়, ইঞ্জিন থেকে হাতুড়ি বাঁটালি নিয়ে লোক আসে, নির্বিকারভাবে ঠিক করে দেয়, গাড়ি চলে আবার নির্বিকারভাবে। পঞ্চাশ টাকা জরিমানার নোটিশটা নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে, আবার কারুর দরকার হয়, থেমে যায় গতি…

কিন্তু থাক এসব কথা এখন। যা বলছিলাম। গাড়িটা থেমে গিয়ে কিন্তু আমার মনের সেই প্রসন্নতাকে নষ্ট করতে পারল না এবার। তার একটু কারণ হয়েছে অবশ্য, গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে গণ্ডকী নদীর সেই সুঁতিটার একেবারে কাছাকাছি এসে, ইঞ্জিনটা খানছয়েক গাড়ি নিয়ে উঠেই পড়েছে পুলটার ওপর।

এই সুঁতিটাকে আমি ভালবাসি। চারিদিকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে যেমন এটা বিশিষ্ট, যাকে বলা যায় ল্যাণ্ডমার্ক (Landmark), আমার জীবনেও তেমনি। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে কতরূপেই না দেখলাম একে। একদিন দেখেছি গণ্ডকীর একটা শাখানদী রূপেই। নিত্য প্রবাহমানা, পূর্ণতোয়া। বাবার কর্মস্থান মহম্মদপুরে গণ্ডকীর কথা বলেছি আগেই, তার সঙ্গে আমার সেই নিবিড় সম্বন্ধ এখানে এসে আবার যেন সেই গণ্ডকীকে কতকটা ফিরে পেতাম।…যেন রেলগাড়িতেই হঠাৎ একটি মেয়ে উঠে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল, মিটি মিটি হেসে প্রশ্ন করছে—"আমায় চেনেন ?"

কার সঙ্গে যেন মিল, কোথায় যেন মিল—গায়ের রঙে, চোখের চাউনিতে, না, ঠোঁটের হাসিতে ?—অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

"আমি হচ্ছি আপনাদের অমুকের (ধ'রে নেওয়া যাক পুষ্পলতার) মেয়ে যে !"

"তাই নাকি?...তাইতো দেখছি।"

—তারপরে যেন আরও অবাক।

এমনি অবাক করলে আমায় এই স্নুঁতিটাও। যেদিন প্রথম পরিচয় পেলাম সেদিন তো বটেই, নবপরিচয়ের বিস্ময়ে—"ও গণ্ডকীর মেয়ে নাকি তুমি? আদর করে আমরা যে তাকে বলি বুড়ি-গণ্ডকী গো!"

তারপরেও অবাক হয়েছি, কিন্তু আনন্দ-বিস্ময়ে নয়। বেদনায়।

বহুদিন পরে একবার যেতে যেতে দেখলাম স্নুঁতির জল প্রবাহহীন। বুঝলাম মায়ের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে মেয়ের। স্নুঁতি এসেছে ভরাট হয়ে, যেখানে ছিল টলটলে জল, সেখানে শুকনো ডাঙার জবর-দখল; ঘাস বিছিয়ে দিয়েছে, ফসল ফলিয়ে দিয়েছে। কষ্ট হয়।

তোমরা নব্য ভারতের Grow-more food অর্থাৎ 'খাদ্য-বাড়াও' তন্ত্রের উপাসক, বলবে ভালোই তো। এত একার (acre) জমি বেরিয়ে এল, এত টন খাদ্য বাড়বে। পেটে ক্ষুধা, 'না' বলতে পারি না। তবুও কোথায় একটা প্রশ্ন যেন অতৃপ্ত থেকেই যায়। মানুষ কি কোথাও কিছু আর থাকতে দেবে না? তার শুধু আননের সংখ্যা যাবে বেড়ে, পৃথিবীতে থাকবে শুধু ক্ষুধা আর খাদ্য! মানুষকে দোষ দিই না, উপায় কি? শুধু ভাবি কী অভিশপ্ত আমরা এই মানবজাতি! কী অভিশপ্ত এই পৃথিবী! একদিন যাকে গর্ভে ধরেছে, যাকে জন্ম দিয়েছে, একদিন শুধু তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে তারই জঠরে প্রবেশ করতে হবে বেচারিকে! নদী যাবে, পাহাড় যাবে, সাগর যাবে, মরুভূমি যাবে, কানন যাবে, প্রান্তর যাবে। সৃষ্টির ওঁ-কার গিয়ে ধ্বংসের একটি মাত্র হুঙ্কার থাকবে জেগে—গ্রো মোর ফুড!! কী অভিশাপ-গ্রস্ত পরিণাম!!

যাই হোক, স্নুঁতিতে এবার জল রয়েছে, আমার সঙ্গে সেইটুকুই সম্বন্ধ। আমি ওমরখৈয়ামে বিশ্বাসী; অত মাথা ঘামিয়ে হবে কি? নগদ যা পাচ্ছ তাই আদর করে মাথায় তুলে নাও—Take the

cash in hand and waive the rest। সুঁতিতে জল রয়েছে এবার। বর্ষায় এখনও খানিকটা করে ঢোকে, তবে এবার বর্ষা ছিল প্রবল, গণ্ডকী-বুড়ি ক্ষেপে উঠেছিল, সুঁতিতে পুরো জল, এমন কি স্রোত পর্যন্ত চলছে এখনও।...ওর এত সুখ শোভা, আর এমন যোগাযোগ হবে যে গাড়ি যাবে ঠিক এইখানটিতে থেমে, আমি দুচোখ ভরে দেখব—এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। ...একটু শ্বেতাভ জলের রাশি দুকূল চেপে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বয়ে, সূর্যের আলোয় ঝলমল। গাংচিলদের ভীড়, মাঝে মাঝে এক একটা ধনুকের মতো বৃত্তাভাসে নেমে এসে গাঙের গায়ে ছোঁ মেরে আবার উঠে যাচ্ছে। জলের পর থেকেই সবুজের রাজ্য, ফসলে ফসলে দুখান তীর ঢাকা। সুঁতি এবারে নিজেও পেয়েছিল প্রচুর, আঁজলা ভরে ঢেলেও দিয়েছে প্রাচুর্য।...দুখানা ডোঙা দাঁড় ঠেলে চলেছে পাশাপাশি, দুজন করে লোক, একজন দাঁড়ে, একজন জাল নিয়ে। প্রায় উলটে গিয়ে যখন তেকোনা জালটা তুলছে, আটকাপড়া ছোট ছোট মাছের ঝাঁক চিক চিক করে উঠছে সূর্যের আলোয়। চারিদিকেই মধ্যাহ্ন শান্তি, তার গায়ে একটি মাত্র শব্দ ; টানা, করুণ ; কি একটা পাখির বোধহয় কাব্য জেগেছে মনে, সঙ্গিনীকে ডাকছে। সঙ্গিনীই না সৌন্দর্যের ষোলকলা ? কে আজ চেন টেনে দিয়ে আমার গাড়িটা থামালে এমন করে ? শতদিনের শতজনের অপরাধ একটি দিনের প্রসাদে যেন নিঃশেষ করে মুছে দিয়েছে।

তাকে দেখলামও সঙ্গে সঙ্গেই। এই নাটকীয় অপ্রত্যাশিতগুলো ঘটে বলেই তো বিশ্বাসটা বেঁচে থাকে যে এই বিরাট পুতুলনাচের পেছনে বসে কেউ টেনে যাচ্ছেই নাচের দড়ি। ইঞ্জিনের লোকটা ঠোকাঠুকি শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল, প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারটা ছিল কি ?"

"দেখিয়ে না, চলে যা রহে হ্যায়"......অর্থাৎ দেখো না ঐ চলে যাচ্ছেন।

গাড়ির পেছন দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি তখন রেলের বাঁধ থেকে নেমে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে; একটি যুবা আর একটি কিশোরী বলাই ঠিক; পরিচ্ছদের হিসেব ধরে আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় একটি বর আর একটি বধূ। নূতন বিয়ে নয় অবশ্য; হয়তো দ্বিরাগমন।

বর হাত দুয়েক এগিয়ে। পরনে হলদে ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর ঐ চাদর, পায়ে লাল মোজা, মাথায় চুমকি বসানো, রঙীন টুপি। কনের পায়ে রঙীন জুতা, আলতা বা মেহদি আছে নিশ্চয়, তবে এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছে না, বড় ফাঁদের মলগুলো শুধু উলটেপালটে দুপুরের রোদ ঠকরে চলেছে। রঙীন রেশমী শাড়ি, তার ওপর কাঁধ-পিঠ ঢেকে একটা উড়ানি, শাড়ি দিয়েই মুখের বেশ খানিকটা পর্যন্ত ঘোমটা টানা। নদীর তীরের উঁচু নীচু জমির ওপর দিয়ে যে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তাটা লতিয়ে লতিয়ে এগিয়ে গেছে—সেইটে ধরে চলেছে দুজনে। চারিদিকে রোদ-মাখা সবুজ আর সবুজ। সামনের গ্রামটা দূরে লিলি করছে।

....চিত্রের সুমুখভাগে আর লোক নেই, নদীর সেই চারটি মাল্লা ছাড়া, তারাও স্রোতের টানে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। পেছনে পুল, তার পাশে আমাদের এই টানা গাড়িটা। সহস্র চক্ষু হয়ে চেয়ে রয়েছে ঐদিকে ··· বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল গাড়িটা।

আরও দূরে চলে গেছে ওরা। একবার ডুবেই গেল সবুজের মধ্যে, নদীর মাঝামাঝি এসে আবার দেখতে পাচ্ছি। ঘোমটাটুকু এর মধ্যে কখন্ খসিয়ে দিয়েছে কনে-বৌ, ঘুরে ঘুরে চাইলেও দু-তিন বার গাড়ির দিকে। আর অত লজ্জা .কিসের? মনে হলো যেন পাশাপাশি হয়ে চলছেও দুজনে।···গাঁয়ের কাছে গিয়ে আবার ঘোমটা টেনে আগু-পিছু হয়ে গেলেই হবে।

তারপরেও আছে গল্প। গল্পই তো বাস্তবকে করে পূর্ণ। আজই

বোধহয় ফুলশয্যা। বর বলবে—"দেখলে তো, গাড়িটা দিলাম কেমন থামিয়ে ?"

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠবে কনের—"আশ্চর্য বাপু। আমার এত ভয় করছিল। কেউ এসে কিছু না বলে। গাড়ির লোকেরাও তো একটু টুঁ শব্দটি করল না। আশ্চয্যি!"

"করলেই হোল আর কি! আমার বাড়ি এখানে, কখন্ স্টেশনে আসবে সেই ভরসায় থেকে তিন কোশ ঘুরে আসতে গেলাম অমনি!"

এবার আর কথাও ফোটে না; শুধু ডাগর চোখদুটিই বলে—"আশ্চয্যি!!"

এইটুকু পুরস্কারের জন্যই তো নেওয়া ঝুঁকিটুকু নৈলে স্টেশনে পালকি ছিল, লোক ছিল; তিন কোশ দূরের কোন্ ব্যবস্থাই বা ছিল না?

কে এই চেন টেনে গাড়ি থামাবার ব্যবস্থাটা করেছিল? বেচারিকে কত অভিসম্পাতই না দিয়েছি এর আগে; আজ অভিনন্দিত করলাম।

সুঁতি পেরিয়ে প্রায় ক্রোশদুয়েক এসে পুষা-রোড স্টেশন। আজ সুঁতির মতোই হত-গৌরব। একসময় কী বোলবোলাও সে। পুষা ছিল সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের কৃষিগবেষণা কেন্দ্র। একে কৃষি-গবেষণা তায় আবার সে-যুগের ইংরাজ সরকারের; আরও কিছু করবার ছিল না হাতে, সুতরাং সুদূর বেহারের মাঝখানে বসে কেন্দ্র-সরকারের রোয়াব খেলাবার প্রচুর অবসর পেতেন কর্তারা। দিল্লির নজর থেকে এত দূরে, আই এন এ বা সত্যাগ্রহ না করেও তো পূর্ণ স্বরাজ। প্রায় প্রতি গাড়িতেই দেখতাম কেউ হোমরা-চোমরা আসছেন বা যাত্রা করছেন দিল্লি অভিমুখে। সমস্ত স্টেশনটা হয়ে রয়েছে থমথমে। বালিকণার ওপর সূর্যের মতো পুষার গায়ে দিল্লি উঠত ঝকমকিয়ে। এখনও শুনেছি কি একটা আছে এখানে, বোধহয় কৃষিবিভাগেরই কিছু, তবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অধীনেই নাকি, দিল্লি ছিল দূরে;

এখন পাটনা, সে তো গঙ্গা পেরুলেই। চোখ তুললেই দেখতে পাবে কি হচ্ছে, কাজেই মুক্তচ্ছন্দ জীবনের সে জলুস কি বজায় রাখা যায় এখন?

তাই পুষা এখন পুরোপুরিই চাষা।

পরের স্টেশন ঢোলিতে এসে শোনা গেল, গাড়ি ছাড়তে দেরি হবে। বাধা সমস্তিপুরের মতোই; সামনের স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে, না পৌছলে পথ খালি পাওয়া যাবে না। এবার অবশ্য প্যাসেঞ্জার গাড়ি।

কিন্তু মালগাড়ি হলেও আপত্তি ছিল না আর; বরং খুশিই হতাম। দেখছি তো, বাইরের বিরূপতার ছদ্মবেশে কে বরাভয় রূপে রয়েছে দাঁড়িয়ে আমার পাশে। স্মৃতির পাড়েও দেখলাম, এখনও তাই গলা বাড়িয়ে দেখি দূরের সিগন্যালটা নামানো রয়েছে বটে, তবে, ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায় না।...বহুদিন ছোঁয়া হয়নি ঢোলির মাটি। কত স্মৃতি যে জড়িত এর সঙ্গে! তা ছাড়া বাবার পায়ের ধুলি আছে মিশে, মারও।...নেমে পড়লাম। বাবার কর্মস্থান গণ্ডকী-তীরের সেই মহম্মদপুর, তার এই রাস্তা। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল পড়ে।

নেমে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেন একটি স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ওদিককার কথা, সে স্বপ্ন কথাই হবে বৈকি। আমি তখন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তোমাদের এখনকার নবম আর কি, ম্যাট্রিক থেকে দু' শ্রেণী নীচে। গরমের ছুটিতে বাবার কাছে এসেছিলাম স্বাস্থ্য শুধরে নিতে, স্কুল খুলবে এবার তাই ফিরছি।

বাবা সঙ্গে আছেন। আশ্চর্য লাগছে ভাবতে, বাবা তখন আমার চেয়েও ছোট। এখনকার, তুমি যা, তার চেয়েও তোমার বাবাকে একদিন ছোট তো নিশ্চয়ই দেখেছ; আমি সেই কথাই বলছি।...ও চিন্তাটা বড় কৌতুকজনক। যাঁরা গত হয়েছেন, তাঁদের শেষ দিকের

চেহারাটাই আমাদের স্মৃতিতে শাশ্বত হয়ে থাকে, বাবা, মা, আরও যাঁরা ছিলেন। তাই আমি এক এক সময় বসে বসে তার ওদিককার চিত্রটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি। যতখানি তাঁদের দেখেছি—সেই শৈশবের চৈতন্য-উন্মেষ থেকে, ততটুকুই নয়; সে তো সুলভ, সবাই করে। আমি মনটাকে পাঠিয়ে দিই আরও দূরের অভিযানে, যখন আমি জন্মাই নি। যিনি বরাবরই ছিলেন সৌম্য, গম্ভীর, এক সময় যে তিনি যে-কোন বালকের মতোই ছিলেন চঞ্চল; বাধ্যতা আদায় করতেই যাঁকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাঁর নিজেরও যে একটি অবাধ্য রূপ ছিল, বাপের কাছে তাড়না খেয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে আবদার করতেন—এ বড় অপূর্ব চিত্র। কল্পনাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে দেখো বড় মিষ্টি লাগে। মায়ের বেলায় মেয়ে বলেই যেন আরও মিষ্টি।...তোমার চেয়ে ছোট, মা আটহাতী শাড়িটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পায়ে আলতা—বিস্ময়কর চিত্র নয় কি একটি?

স্টেশনের বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। অনেক দিনের মধ্যে একটি দিন যেন বেশি পা বাড়িয়ে থাকে, সেইটি এসে পড়ল কালের অলিন্দ বেয়ে।...দুই বলদে টানা কুঠির শাম্পানী-গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে; হৃষ্টপুষ্ট বলদ দুটার গলা দুলছে, গলার ঘন্টি বাজছে টিং টিং করে। সামনে এসে দাঁড়াল তেজী বলদ, চলার ঝোঁকে বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে একটু; বাহালমান্ (গাড়োয়ান) নেমে একটার পিঠে দুটো আদরের চড় বসিয়ে বলল—"হও, হও"। অর্থাৎ ঠাণ্ডা হ'।......কিম্বা হয়তো অন্য ব্যাপার, ঘোড়ার বেলায় কোচ-ম্যান্‌রা যখন করে তখন ওই বা করবে না কেন? সাওয়ারি কুঠির খোদ কেশিয়ার বাবু, তাঁর ছেলে; কম কি?

পেছনের দরজা দিয়ে বাবা আর আমি নামলাম।

চিত্রটিকে যেন দাগে দাগে বুলিয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি—অর্থাৎ এই এখনকার আমি বারান্দা ছেড়ে স্টেশনের ভেতরের দিকে এলাম।

এ আমি যেন লুপ্ত হয়ে গেছি, বয়স থেকে পঞ্চাশটা বছর গেছে খসে, বাবার পেছনে পেছনে স্টেশনের ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।...আজ ভীড় বড্ড বেশি, স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্কের খটখটানি আর থামতেই চায় না। ওদিকে টেলিফোনের ঘটাং ঘটাং। তখন এত সব কিছু ছিল না। যাত্রীও ঢের কম, ওদিকে একা ধন নীলমণি স্টেশন মাস্টার একাই সর্বত্র—টিকিট কাটতে, টেলিগ্রামের কলের টকাটক ধরতে, তারপর গাড়ি এলে আবার টিকিট আদায় করে নিতে।

সে সময় স্টেশনমাস্টার ছিলেন একজন বাঙালী, নামটা ভুলে যাচ্ছি। টুলে বসে লিখছিলেন, বাবাকে দেখে স্বাগত করলেন—"এই যে, আসুন, আসুন। তারপর? —বাড়ি-মুখো-নাকি?"

ঘুরে বসলেন।

"আরে! তম্বাকু ভর্।"

বাবা গিয়ে একটা টুলে বসলেন। যতদূর মনে পড়ছে চেয়ারের বালাই ছিল না এসব ছোটখাটো স্টেশনে। বি এন ডব্লিউ আর ছিল শুনেছি নাকি খোদ ইংলণ্ডের রাজার সম্পত্তি—অন্তত "সিংহের ভাগ"টা তাঁরই। বেনিয়া রাজা, বলাই বাহুল্য হিসাবে খুব দড়। বাড়তি লোক ছিল না একটা; যেখানে দাঁড়িয়ে চলে সেখানে টুল থাকত না, যেখানে টুলে চলে সেখানে চেয়ার থাকত না। মালগাড়ি করেই যদি শোনপুরের মেলাটা (পৃথিবীর বৃহত্তম) সামলে নিতে পারা যায় তো তাই চলুক না। সিন্দুকে তুলেছিলও তেমনি টাকার কাঁড়ি।

প্রায় শূন্য ঘর তাই মনে হচ্ছে এখনকার চেয়ে যেন অনেক বড়। তামাক এল, ওঁদের গল্প চলতেই লাগল। বেশ মনে পড়ে স্টেশন-মাস্টারমশাইকে। বেঁটে, একটু স্থূল, টুকটুক করছে রং, আর একটু গল্পপ্রিয় ছিলেন। বাবাও ছিলেন কতকটা তাই। অল্পের মধ্যেই জমে উঠত ওঁদের গল্প।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে বসলাম একটি ছেলের পাশে; মেঝের মাদুর বিছিয়ে পড়ছে। আমাদের গল্পও জমে উঠতে দেরি হলো না।

ও হচ্ছে, মাস্টারমশাইয়ের বড় ছেলে, নাম যতীন। মজঃফরপুরের মুখার্জি সেমিনারিতে ও নবম শ্রেণীতে পড়ে। ছুটির জন্যে কতগুলা অনুশীলনী (Exercise) দিয়েছে স্কুলে, নেস্‌ফীল্ডের গ্রামার থেকে, সেইগুলা করছে। সেদিন ছাত্রজীবনের একটা যেন রোমান্স তুলে ধরেছিল যতীন আমার চোখের সামনে।

দ্বারভাঙ্গায় আমরা তখন অনেকটা গেঁয়ো গোছের ছিলাম। ছোট শহর, মাত্র দুটি স্কুল, তার একটি টিম টিম করছে, কলেজ নেই। রেলের দিক থেকেও জায়গাটা তখন বাইরে থেকে আরও বিচ্ছিন্ন। তার জায়গায় ও মজঃফরপুরের ছাত্র, তাও মুখার্জি সেমিনারি, খুব বিস্মিত করে দিয়েছিল। মজঃফরপুর তখন উত্তর বিহারের আদর্শ শহর (অবশ্য, এখনও অনেকটা) শিক্ষা-দীক্ষা খেলাধূলা—সব তাতেই অগ্রণী। সেই মজঃফরপুরের ছাত্র একজন আমার সামনে বসে জ্ঞানচর্চায় রত; তাও যে সে স্কুলের ছাত্র নয়, একেবারে মুখার্জির সেমিনারীর; মজঃফরপুরের মধ্যে যার জায়গা স্কুলের মধ্যে একেবারে শীর্ষে। একটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। যতীন যেন অন্য লোকেরই মানুষ।

বড় শহরের ছেলেরা কেমন বেশ চট্ করে ধরেও ফেলে ছোট শহরের গেঁয়োদের, আর কিছু গুণ থাকুক বা নাই থাক মুরুব্বিয়ানা-টুকু বেশ রপ্ত করে ফেলে তাড়াতাড়ি। এর পর উত্তর জীবনে ঐ মজঃফরপুরে থেকেছি বহুদিন, ঐ মুখার্জি সেমিনারিতেই মাস্টারি করেছি, ঐ যতীনের সঙ্গেই। জটলা করে আড্ডা মেরেছি। জ্ঞান-তপস্বী না আরও কিছু। ঘোর আড্ডাবাজ ছোক্‌রা। গল্পের ফুলঝুরি-বড় বড় চোখ দুটোতে কৌতুক আর হাসি উপছে পড়ছে। এত কথা জমা পেটে যে বলবার সময় যেন যথেষ্ট নেই 'হাতে। তাই থেকেই একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—কোন বাক্য (Sentence) পুরো-পুরো উচ্চারণ করতে পারে না। টুকরো টুকরো কথায় কাজ সেরে

যায়, চোখ দুটো থাকে নাচতে। যদি অভ্যস্ত না থাক, বা কান দুটো যথেষ্ট সজাগ না থাকে তো কিছু ধরতেই পারবে না অনেক সময়।

মজঃফরপুরে ছিলামও অনেকদিন, ওর সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। কাজেই রোমান্স ভেঙেই গিয়েছিল, অতি পরিচয়ে যা হতে বাধ্য। কিন্তু সেদিনের যতীন যে কী মায়ায় সৃষ্টি করেছিল, সবটুকু গিয়েও এটুকু যেন অমর অম্লান হয়ে রয়েছে আমার মনে। কী করে যে এটা হয়!

এর চেয়েও কিন্তু যেন আরও আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেল সন্ত সন্ত। এসবই বা কি করে হয়? শুধুই চান্স—অন্ধ যোগাযোগ একটা, না, সত্যই তোমাদের এই ফিজিক্যাল প্ল্যান বা পঞ্চভূতের স্তরের অন্তরালেও ঘটে কিছু—মন টানে মনকে?

ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছি যেন। ঘুরে বেরুতে যাব ঘর থেকে, একেবারে মুখোমুখি, হ্যাঁ, যতীনের সঙ্গেই!

নিশ্চয় ওর কথাটাই ভাবছিলাম বলে আমিই আগে চিনলাম বললাম—"আরে যতীন না! তোমার কথাই ভাবছিলাম..."

"মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট" খেদমতে হাজির। কিন্তু..."

আরম্ভ করে দিল যতীন। চেনেনি, কিন্তু ফাজলামির সুযোগ পেলে তো চেনা-অচেনা বাছত না। মুখের দিকে চেয়ে আছে, চোখ দুটোয় চিকচিক করছে কৌতুক আর কৌতূহল। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরেই—"ও!...আরে আমাদের..."

সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার হাতের ওপরটা টিপেটিপে দেখল বার দুই, বলল—"দাঁড়াও, দেখে নি জ্যান্ত কি...না, আর সেটা মুখে আনতে হলো না। রিয়েল হাড্ডি আর মাস।...পঁচিশ বচ্ছর হে, না, আরও বেশি?...ওঁরা মায়ার টানে মাঝে মাঝে ওপর থেকে নেমে আসেন যে, পুরনো জায়গা তো...ছ্যাখো, অবাক চেয়ে আছে লোকটা! সেই পুরনো অবাক চাউনি!"

অবাক হয়েই আছি চেয়ে। কত বদলে গেছে, এক বয়সীই তো,

দীর্ঘদিনে অনেক কিছুই তুলে দিতে হয়েছে কালের হাতে, কিন্তু কি ঘুষ দিয়ে যে সেই বিদ্যুৎটাকে আটকে রেখেছে যতীন—চোখে, মুখে, কপালে, ভ্রূতে; সারা দেহের গ্রন্থিতে। কিম্বা হয়তো ঘুষ দিল না বলেই পেরেছে, হালকা তুড়ির ওপরই তো চালিয়ে নিয়ে এল জীবনটাকে এতদূর।

"আরে এ যে…"

হাতটা তুলে একটা চড় বসিয়ে সংবিৎটা ফিরিয়ে আনল আমার; বলল—"চলো বাইরে—ভীড় বাড়াচ্ছ—বিনি টিকিটের যাত্রা দেখছে সবাই।"

বাইরে এসে, যাত্রা দেখবার ভীড় নেই এইরকম একটা জায়গা দেখে দাঁড়ালাম দুজনে। প্রশ্ন করল—"তারপর, তুমি এখানে?"

এতদিন পরে ওকে হঠাৎ এভাবে পেয়ে সত্যিই আহ্লাদে অভিভূত হয়ে গেছি যেন। এখানে নামার কারণটা তো দেখছেই, স্টেশনের ভেতরে যাওয়ার কারণটাও বললাম, তারপর প্রশ্ন করলাম—"হ্যাহেঁ, তোমার সেই সেদিনের কথা মনে পড়ে? সে তো আবার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। সেই আমরা এলাম, মহম্মদপুর থেকে, তুমি মাদুরে বসে স্কুলের টাস্ক করছ…"

চোখ দুটো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে, সেই হাসিটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে যেন মাথার বিস্তীর্ণ টাক পর্যন্ত, বলল—"শোন কথা! ভোলা যায় যেন প্রথম প্রেম!—পঞ্চাশ বছর ধরে এক নাগাড়ে পঞ্চাশখানা প্রেম করে গেলেও! কোনটা আগে জিজ্ঞেস… আচ্ছা করছ কি তাই বলো।"

বলে জিগ্যেস করলাম—"আর তুমি? মাস্টারি, ওকালতি, কন্ট্রাক্টারি, তারপর এখন?"

"ব্যবসা।"

"বেশ কথা। তা—চলছে?"

"গড়গড়িয়ে।"

"তামা—"—জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তামাসা করছে নাকি; মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল—

"তামাক নয়, ভাজাভুজি।"

মাখানা বলে এ প্রান্তে একরকম জলজ উদ্ভিদের ব্যবসা চলে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত, পদ্মবিচির মত গোলগাল বিচি, ভেজে খেতে হয়, চালানও ভাজা অবস্থাতেই। স্তম্ভিত করে দিয়ে যতীন বুঝেও নিয়েছে ঐ আন্দাজই করব—যা ভেবেছ তা নয়—"ভারাগুা ভাজা।" —বলে কাঁধে একটা চড় মেরে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলেই চলল ওর ইতিহাস।

এইখানেই একটা বাড়ি করেছে। তারপর দুনিয়ার সব দেখে শুনে এসে নিরিবিলি জীবনযাপন করছে। আর কেন? এতদিন পর্যন্ত যে টাকাগুলো জলাঞ্জলি দিয়েছে, সেগুলায় আর যাই হোক অধিকার ছিল খানিকটা—বাবার টাকা, তারপর নিজের টাকা; এখন হাত দিতে হলে ছেলের টাকায় হাত দিতে হয়।...কথায় বুঝলাম, ছেলেটি বেশ মানুষ হয়েছে। বিদেশ থেকে ঘুরে এসোছল, এখন বেশ বড় কাজ নিয়েই রয়েছে।

মনের ওপর মনের টানের কথা একটু আগে বললাম না তোমায়? কথাটা যতীন নিজেই প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ হে, এগুলো কি করে হয় বলতো?"

"কিগুলো?"—প্রশ্ন করলাম।

"এই দুপুরে টেনে আনল—দিলেই না ঘুমুতে—ঘুমই তো এখন সাধনা, বলো? তা স্রেফ দিলেই না—যেন নাড়া দিচ্ছে মনের দোরের কড়া ধরে (সাহিত্য করছ তো এখনও?)—ওঠ্, ওঠ্— স্টেশনে যেতেই হবে।...অবাক কাণ্ড! আর আর সবাইকে ছেড়ে ঠিক তোমার পাশটিতে দাঁড় করিয়েছে! তুমি ঘুরলেই চার চোখের মিলন হবে। আর আগে স্টেজ সেট (stage set)—এখানে দুটো

গাড়ির ক্রসিঙের (crossing) কথা নয়—আজ হবে—হতেই হবে—বিশ্বাস করনা এসব ?"

আশ্চর্য হয়ে গেছি বৈকি ; কিন্তু সবাই তো ওর মতো মন খুলে স্বীকার করবার ক্ষমতা রাখে না ; বিজ্ঞানের যুগের মানুষ না আমরা ? একটু যেন এড়িয়ে গিয়ে বললাম—"জায়গাটার যে একটা ট্রাডিশনই আছে, ভুলি কি করে সে কথা ? দু'পা এগিয়েই তো হরিহরক্ষেত্র।"

"You have said it—(খাসা বলেছ)" বলে যতীন আর-একটা চড় বসালো কাঁধে।

—"আর কম কিসে ? আমার চেয়ে বড় ভ্যাগাবণ্ড ছিলেন নাকি হর ?...কিন্তু এই দেখো—আসল বাদ পড়ে গেল।"

"কি ?"

"চলো —একবার ঝেড়ে আসতে হবে না পায়ের ধুলো—গরীবের আস্তানায় ?"

সামনে আঙুল দেখালাম। গাড়িটা এসে গেছে বাইরের সিগন্যালের কাছে।

যতীন ওদিকে পিছন ফিরে ছিল ঘুরে দেখে নিয়ে বলল—"ওখানেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়—ঢোলি স্টেশন, হরের খাস এলাকা—কী যে বলে ও।..."

পা বাড়িয়েছিল স্টেশনের দিকে,—স্টেশনমাস্টারকে বলে আটকে দেবে গাড়ি, আমি হাতটা ধরে ফেললাম।...ঠিক হয় না, বিলম্বিত গাড়ি আমাদের জন্যে আরও দেরি করে বসবে, বাধে যেন বিবেকে। তা ভিন্ন আরও একটা কথা। যার দেওয়ার, সে তো ঠিকই দেয়—যতটুকু উচিত, যতটুকুতে পাত্রটা ভরে ওঠে। তার বেশি হয়ও না সঞ্চয়, উপচে পড়ে পাত্র থেকে। ভরা পাত্রের আনন্দ নিয়ে বিদায় হওয়াই ভালো। কথা দিয়ে এলাম—আবার ওকে উদ্দেশ করেই আসব একদিন।

ভালোই করেছি। গাড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফরমের শেষে এলে ওর

বাড়িটা ভালো করে দেখলাম। রেলের ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে একটা বাগান, তার মাঝখানে গাছের আড়ালে কোটা বাড়ি; খানিক দেখা যায়, খানিক নজরের বাইরে। অনেক রকম গাছ, বাংলারও কিছু কিছু; গোটা কয়েক আমের গাছে গুচ্ছে গুচ্ছে আম ঝুলছে—দেরীর ফসল। ভালোই হলো, বন্ধুর জীবনের এই পূর্ণতার মাঝে মাত্র কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত ব্যয় করে আসতে গেলে, শুধু একটা অতৃপ্তি নিয়েই ফিরে আসতে হতো।...তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে হে দেওয়ার রাজা। পাত্র আমার পূর্ণতায় ছলছল করছে।

তা করবেই কিনা। রাজা যে আবার কবি, শিল্পী, বিরোধ-বিলাসী। পূর্ণতা না হলে শূন্যতার বেদনা ফুটবে কেন ভালো করে? যখন মনে হবে ঠিক আছে, বিলকুল ঠিক, সেই সময়েই না বেঠিক এসে সামনে দাঁড়াবে তার বিদ্রূপের হাসিটি মুখে করে।...সেই কথাই বলি এবার—

মজঃফরপুরে গাড়িটা এলে নেমে পড়লাম, দেখি, যদি একখানা টাইম-টেবিল মেলে এখানে। দুর্ভোগ রয়েছে কপালে, দুর্মতি এসে জুটবেই তো।

দুর্মতি ভিন্ন আর কি বলব? যে গাড়ি এক ঘণ্টার ওপর লেট, তা থেকে নেমে কেউ পুল পেরিয়ে টাইম-টেবিল কিনতে যায় না। তাও জেনে শুনে যে হুইলারের স্টল পড়ছে প্ল্যাটফরমের একেবারে ও-মুড়োয়। তাও আবার এ-লাইনের প্ল্যাটফরম, জান তো এ লাইনের দৈর্ঘ্য আছে, ওসার নেই (মনে রাখতে হবে দুবার নাম পাল্টালেও এ সেই আদি অকৃত্রিম বি এন ডব্লিউ আর)। মজঃফরপুরের মতো স্টেশনে যেখানে পাশাপাশি অন্ততঃ চারখানা প্ল্যাটফরম থাকা উচিত ছিল, সভ্য রকম সাইজের, সেখানে দুখানা মাত্র বসিয়ে দিয়ে ছ'খানা করেছে। ফলে এ-লাইনের স্বভাবসিদ্ধ গোলমালগুলো আরও গেছে জটিল হয়ে।

ভুলই করেছিলাম। তবে গুরুবল, কোন ক্ষতি হলো না। পুলে উঠে মাত্র কয়েক পা গিয়েছি, একেবারে হাতাহাতি হওয়ার গোত্র। না আমার সঙ্গে নয়। দুটি যুবা, বছর পঁচিশ থেকে সাতাশ-আঠাশের মধ্যে বয়স। ভদ্রসন্তানই, একজনের সাজগোজে একটু পাড়াগাঁয়ের ভাব আছে, একজনের শহর ঘেঁষাই, দুদিক থেকেই আসছিল, দেখা হতেই অশ্রাব্য গালাগালির তুবড়ি দুজনের মুখে। নিজের তাগিদেই হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম,কে আগে আরম্ভ করল,অত লক্ষ্য করিনি ; যখন মনটা গেল ওদিকে দেখি, এ যা বলে, ও তার সুদে আসলে মিলিয়ে জবাব দেয়। এই করে এগুতে এগুতে দুজনে দু হাতে পাঞ্জা কষাকষি করে দাঁড়িয়ে পড়ে গালাগালের তুবড়ি ফোটাতে লাগল। হঠাৎ এক বিপরীত কাণ্ড ; স্টেশনের লোকেরা নিজের ধান্ধায় থাকে ব্যস্ত ; বিশেষ করে গাড়ির সময়, তবু দেখতে দেখতে কিছু লোক জমে একটু ভিড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল। পৃথিবীটা তামাসা খুঁজে বেড়াবার লোকেই প্রায় ভরাট, তবু প্রকৃত শান্তিকামীর ছিঁটে-ফোঁটা আছেই ; কিন্তু এরা যতই নরম করবার চেষ্টা করে, ওরা যেন ততই উগ্র হয়ে ওঠে। এই করে করে যখন চরমের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে, পাঞ্জা ঠেলাঠেলি হতে হতে প্রায় বুকে বুকে ধাক্কা লাগে, একজন আর তাল রাখতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠল, বলল—"আপনারা যে যার কাজে যান, ও শা—আমার ভাইকে ওর বোন দিয়েছে না, দুটো মিষ্টি কথা বলে খাতির করছি।"

বাড়িয়ে যা উত্তর হলো তাকে ভদ্রতম সাজ পরালেও এই দাঁড়ায় যে, সেটা তো বিবাহই, ওর ভগ্নী—বিবাহ নয়—স্ব-ইচ্ছায়ই এর সঙ্গে চলে এসেছে ঘর ছেড়ে।

বাঁচলাম। না, কথাটা যদি সত্যি হয় তার জন্যে নয়, বলছি, প্রচ্ছন্ন রসিকতার যে মাঝপথে আটকে দিয়েছিল তাতে যে ভুলটা করে বসেছিলাম সেটা সামলে গেল। গাড়িটা যে ওদিকে আমার সঙ্গে রসিকতা করবার যোগাড় করেছিল, পঁচিশ মিনিটের লম্বা বিরক্তি

দশ মিনিটে সামলে নিয়ে সেটা খাটল না। কাছেই ছিলাম, হুইসিল দিতে ঘুরে পা বাড়ালাম।

ভীড়টা ছড়িয়ে পড়েছে চুদিকে। কারুর কারুর মুখে আছে কিছু কিছু মন্তব্য তবে বেশির ভাগই নীরব, বোধহয় ভাবটা—এমন আর বেশি কথা কি? দুনিয়াটা যখন শ্যালক-ভগ্নীপতিতে ঠাসা তখন এ ধরনের রসঘন যোগাযোগ তো আখছারই হবে।...তাড়াতাড়ি নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসলাম।

ক্ষতি হয়নি বলেছি? ভুল বলেছি। রসিকতার হিড়কে আটকে যাওয়ার গাড়িটা হাতছাড়া হোলো না বটে, কিন্তু গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যে ক্ষতিটা হওয়ার সেটা হয়েই গেল। গাড়িতে বসে থাকলে যাত্রীদের কে কোথায় যাচ্ছে খানিক খানক খবর পাওয়া যায়। হয়তো কারুর পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নমস্কার করে প্রশ্ন—"কোথায় চলেছেন?" হয়তো আমাকেই কেউ প্রশ্নটা করতেন; হয়তো বা নেহাতই চুপ করে বসে থাকবার অস্বস্তিতে কি আমিই প্রশ্ন করতাম আমার পাশে নূতন যিনি এসে বসলেন তাঁকে। বড় স্টেশনে বেশি লোকের ওঠা-নামায় এর সম্ভাবনাটা সাধারণত বেশি থাকে। আমার পক্ষে আবার বিশেষ করে এইজন্যে ছিল যে, মজঃফরপুরে বাঙালী যাত্রীর যাতায়াত বেশি। অনুপস্থিত থেকে এই সুযোগটা নষ্ট করলাম, যখন এসে বসলাম তখন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পালা একরকম শেষ হয়ে গেছে গাড়ির মধ্যে।

অবশ্য আমার পক্ষে খানিকটা বাকিই আছে বলা যায়, কেননা আমার পাশেই একটি বাঙালী পরিবার এসে বসেছেন। গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মনটা ছিট্‌কে অন্যদিকে গিয়ে পড়ল,—আমার জিনিসপত্রগুলো কোথায়।

খুব খোঁজাখুঁজি করবার আগেই অবশ্য পাওয়া গেল। পরিবারটি, মা-ষষ্ঠির বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট; কর্তা, গিন্নী তারপর কোলেরটি পর্যন্ত নিয়ে সর্বসাকুল্যে তেরটি। আমার মালপত্র ওঁদের গুলার মধ্যে চাপা

পড়েছে, দু-একটা স্থানান্তরিত হওয়ায় (ওঁদের প্রয়োজনে) হঠাৎ একটু বিভ্রাট ঘটিয়েছিল।

যখন দেখে শুনে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসলাম তখন গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে।

প্রশ্নটা করলেনও। একটু "কিন্তু" হয়ে পড়েছেন প্রথমটা তারই জবাবদিহিই দিলেন—"আপনাকেও খানিকটা বিব্রত করলাম, সমস্ত সংসারটি ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে তো।…কোথায় যেতে হবে আপনাকে ?

প্রথমে ভদ্রতা রক্ষাই করলাম, উত্তরটা থাকল বাকি ; বললাম—"না, বিব্রত কিসের ? মনে হচ্ছে যেন বদলি হয়ে যাচ্ছেন কোথাও !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মোতিহারি, আসছি সেই…"

আমি একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে বসেচি—"মোতিহারি ? তা এ গাড়িতে !"

গৃহিণী, দু তিনটি মেয়ে, শিশু কোলে ওটি বোধ হয় পুত্রবধূ—ওরা তিনজনেও চকিত হয়ে মুখের দিকে চেয়েছে, উনি তো আছেনই। কিন্তু কেন জানি না, উত্তরটা উনি অন্যদিকে দিয়ে দিলেন, বললেন—"কেন, এইটেই সুবিধের নয় ? আমি আসছি ডালটনগঞ্জ থেকে, টাইমটেবিলে দেখলাম এইটেতেই বেশ দিনে দিনে পৌঁছে যাওয়া যায়…"

কতকটা কানে যাচ্ছে, কতকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। প্রায় বলেই ফেলতে যাচ্ছিলাম, "কিন্তু এ গাড়ি তো মোতিহারির নয়, পাটনার।"—এমন সময় চোখের সামনে পাটনার নগ্ন লাইন জোড়া জেগে উঠল। মনের ধর্মই হচ্ছে বিপদকে টপ করে মেনে নিতে চায় না। কিন্তু ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই ; পাটনার লাইনটা বহুদূর বর্তুল আকারে ঘুরে গেছে স্টেশন থেকে, মোতিহারির লাইনটা সোজা, এই যা চলেছি ; পাটনার লাইন বাঁয়ে, মোতিহারিরটা ডাইনে।

তার চেয়ে বড় প্রমাণ আমি অযাত্রায় বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, এ হতেই হবে।

আমায় যেন ঘাড় টিপে মানিয়ে ছাড়া আবার। অযাত্রায় বাড়ি ছেড়েছি, ভুল গাড়িতে না চড়ে গত্যন্তর নেই আমার।.... এখন উপায় কি ?

কিন্তু উপায়ের চিন্তাটা মনে উদয় হয়ে তখনই গেল মিলিয়ে। আজ এই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই কি করে ? পৃথিবীতে যতগুলো আহাম্মকি আছে তার মধ্যে রেলগাড়ির এলাকায় বড় বড় দুটো পড়ে : ভুল গাড়িতে চেপে বসা আর ওভার-ক্যারেড (over carried) হওয়া, অর্থাৎ গন্তব্যের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়া। একটা কথা একটু মিলিয়ে দেখো, গাড়িতে চড়লে লোকে হঠাৎ একটু কৌতুকপ্রবণ হয়ে ওঠে তার কারণ, বাড়ির ঝামেলার বাইরে থাকায় মনটা থাকে নিশ্চিন্ত, হালকা ; তার ওপর গাড়ির গতিবেগ দেহমনে সুড়সুড়ি দিয়ে এক ধরনের যেন ছেলেমানুষীই জাগিয়ে তোলে খানিকটা। মনটা কৌতুক খোঁজে। আর কৌতুক বস্তুটা সবচেয়ে উপভোগ্য হয় যখন সেটা পরের ঘাড় দিয়ে উপলব্ধ হয় ; ইংরাজিতে চমৎকার কথাটি রয়েছে এর জন্যে---At the cost of others ; জাতটা আমাদের চেয়ে রগুড়েই তো।

দুটো আহাম্মকির কথা যে বললাম তার মধ্যে একটার—অর্থাৎ ওভার-ক্যারেড হওয়ার খানিকটা মার্জনা আছে, কেননা ওটা প্রায় ঘটে নিদ্রিতাবস্থায়।···অত হাসি নয়, আহা, লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল করবে কি ? কিন্তু একটা লোক, বয়সের গাছপাথর নেই, চোখ চেয়ে (চশমাও যে নেই এমন নয়) পাটনার গাড়ি ছেড়ে একেবারে উল্‌টোদিকে মোতিহারির গাড়িতে চেপে বসেছে, এর যেন আর রেয়ায়েৎ নেই। ···কোথায় যাওয়ার কথা কোথায় চলেছি সে চিন্তা গিয়ে ভাবনা দাঁড়িয়েছে এতগুলি দৃষ্টির কৌতুক—উচ্ছলতা থেকে কি করে বাঁচাই নিজেকে এখন। বিশেষ করে ভয় করে মেয়েদের। একবার একটা

ঘরোয়া আহাম্মকিতে আমার এক মাসতুতো বোন হেসে ফেলেছিল; মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাধ্যমতো সমীহ বজায় রেখেই হেসে ফেলেছিল বেচারি—প্রায় চল্লিশ বছরের কথা, এখনও তার লজ্জাটা মনে লেগে আছে।

গৃহিণী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়েই নিজের হাসিটা গোপন করে মেয়েদের চোখ রাঙাবেন; বধূটির আরও সুবিধা, সে কোলের ছেলেটির সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিয়ে হাসির মোড় ফিরিয়ে দেবে—আমায় বাঁচাবারই চেষ্টা; কিন্তু মন্ত্র যতই গুপ্ত ততই যে প্রাণঘাতী; আমি করি কি এখন?

দারুণ বিপদের মধ্যেই মানুষ নিজেকে নব নব ভাবে আবিষ্কার করে। কি করে যে ইতিমধ্যে চেহারাটা বদলে নিয়েছি বলতে পারি না—অর্থাৎ এদিকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, তবে সহজ ভাবটা কয়েকটা সেকেণ্ড বাদ দিয়ে প্রায় বজায় রেখেই গেছি। ওঁর প্রশ্নটা অবশ্য এগিয়ে আনছি না, তবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি তার জন্যে।

"আর কিছু কি খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি?"—উনি প্রশ্ন করলেন নিশ্চয়ই ঐ কয়েক সেকেণ্ডের বিভ্রমতা লক্ষ্য করেই।

উত্তর করলাম—"না ···মনে হয়েছিল বটে তাই—ঐ গেলাসটা দেখছি, ঠিকই কুঁজোর মাথায়!"—বেশ গুছিয়েই তো বললাম।

"কতদূর যাবেন বললেন না তো?"

"যাব বেতিয়ায় আপনাদের কয়েক স্টেশন ওদিকে। তবে আপাতত একবার পরের স্টেশনেই নামতে হবে।"—মোটেই দেরি হলো না আর জবাবটা দিতে। একটু কাজও এগিয়ে নিলাম, বললাম—"তাই ভাবছি জিনিসগুলো দরজার সামনেই জড়ো করে রাখি না নয়। গাড়ি থামে না তো বেশিক্ষণ, তায় ছোট স্টেশন, কুলিও পাব না।"

"সোহি কিজিয়ে। বহি আকিলমন্দিকা কাম হোগা।" (তাই করুন সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে)।

কথাটা শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল; বলছেন পাশের বেহারী ভদ্রলোকটি। তবে কি "আকিলমন্দির" অন্য কোথায় অভাব হয়েছে সেটা ধরা পড়ে গেছে কাছে?

টের পেলাম তা নয়। এমনি অযাচিতভাবে একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ সমর্থন করেছেন।...আমি নেমে গেলে উনি ধারের ভালো জায়গাটুকুও পাবেন। হোল্ড-অল একটা বড় স্যুটকেস, একটা ব্যাগ একটা জলের কুঁজা; দোরের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্যও করলেন। মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে বসলাম।

মঘা, সামলাবি ক' ঘা?

আবার আরম্ভ হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে মোটঘাট পায়ের কাছে জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছি। প্ল্যাটফরমে নয়। প্ল্যাটফরমের দিকে গাড়ির যে দরজাটা সেটা একটা বরযাত্রীর নানারকম দ্রব্যসম্ভারে চাপা —কন্যাপক্ষের উপঢৌকন বাঁশের বাতার ফুলপাখী বসানো বড় বড় চাঙারি, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে ভরা: চৌকি, বাক্স, তোরঙ্গ, আলপনা আঁকা বড় বড় দুটো হাঁড়িতে দই। একটা সাস্ত্রী গোছের লোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, বেরুতেও দেবে না, ঢুকতেও দেবে না।

নালিশ নেই, বিচার নেই: উল্টোদিকেই নেমে দাঁড়িয়ে আছি।

তাও গড়িটা যদি তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায় তো বাঁচি। গাড়িসুদ্ধ লোক গলা বাড়িয়ে হাঁ করে দেখছে (অন্তত চোখ তুলে দেখতে পারছি না বলে আমার তাই মনে হচ্ছে)— ভেবে পাচ্ছে না, এরকম অঘাটায় হঠাৎ একজন বাঙালী ভদ্রলোক কি করতে নেমে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ভয়ে চেঁচিয়ে কুলি ডাকতে পারছি না।...আবার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল; বেহারী ভদ্রলোকটি বলছেন "আপ্ গলতি কিয়া।" (আপনি ভুল করেছেন)

যার আগাগোড়াই 'গলতি' আর 'আকিলমন্দির' অভাব আর সেটা ঢাকবার জন্যে যে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠবেই;

আমি একটু হেসে বললাম—"নেহি, ইসি স্টেশনমে উৎরনা হ্যায়।" অর্থাৎ ভুল করিনি, এই স্টেশনেই নামবার কথা আমার।

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু পাড়া গাঁ-ঘেঁষা, যেটা মনে আসে সাজিয়ে গুছিয়ে না ব'লে সোজাই ব'লে দেন। একটু হেসেই জানালেন —সেকথা বলছেন না, এক জায়গার টিকিট কিনে অন্য জায়গায় নামবে এতটা 'আকিলমন্দির' অভাব কার হবে? ওঁর বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব জায়গায় আগে থাকতে খবর না দিয়ে আসাটা…

আমি হেসে স্বীকার করে নিলাম—বেয়াকুবিই একটা, তাই তো দেখছি।

—অর্থাৎ যে ধরনের কথা ওঁর মুখ দিয়ে বেরুতে পারত আগেভাগেই ব্যবহার করে হাঙ্গামা মিটিয়ে রাখলাম। কেন জানি না, ভদ্রলোক এবার একটু ভালোভাবেই হেসে উঠলেন, জানালেন—না, বেকুবি কিসের? তবে কুলি পাওয়া যায় না, সাওয়ারি পাওয়া যায় না—আগে থাকতে জানিয়ে রাখলে এরকম নাকাল হ'তে হতো না…

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

গিন্নির কণ্ঠের ধমক কানে গেল--"তোদের অত খোঁজে কাজ কি? —কেন নামলেন, বেকুবি কাকে বলে!…"

ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয় অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

তাহলে ভালো করে কি সবটা চাপা দেওয়া গেল না?…মরুকগে। সবটা ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। গাড়ি বেরিয়ে গেছে প্ল্যাটফরম থেকে।

বেহারী লোকটি সত্যই সজ্জন; গলা বাড়িয়ে দেখছেন কি হল না হল।

ঝেড়েই ফেললাম কি? যা সমস্যা সামনে তাতে অন্য কোন চিন্তা মনে ঠাঁই পাবে কি করে? চারিদিক খাঁ খাঁ করছে, যা দু-একজন লোক নেমে থাকবে, আগেই চলে গেছে। মাথার ওপর আশ্বিনের ঝাঁঝাল রোদ যেন চাবুক কষছে।

চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাইতে চাইতে নজর পড়ল স্টেশনেরই বারান্দায় থামের একটু আড়াল হয়ে একটি লোক একদৃষ্টে এই দিকে চেয়ে আছে। গায়ে একটা নীল রঙের জামা, মাথায় হাল্‌কা পাগড়ি দেখে কুলিই মনে হল। ডাক দিলাম; লোকটা বেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বললাম—"এইটুকু নিয়ে গিয়ে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দিবি?"

একবার স্টেশনের দিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"পরতীচ্ছা ঘর?"

—মনে হল রাষ্ট্রভাষার একজন কট্টর গোঁসাই। বললাম—"হ্যাঁ। প্রতীক্ষা ঘর।"

জানালো—ও কিন্তু কুলি নয়।

পোশাকটার ওপর আপনিই একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, বললাম—"থাক তাহলে, নিজেই নিয়ে যাই একটা একটা করে।"

হোল্ডঅলটায় হাত দিতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেলল আমার। জিভ কেটে বলল—"সে কি, ইজ্জতদার লোক আপনি, আপনার ইজ্জত যাবে···আমি থাকতে?"

বললাম—"তাহলে নিয়ে চল্‌।"

একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্টেশনের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—একটু গলা নামিয়েই বলল—"আর কোন কথা নয়তো বাবু আমি কুলি নয়, পয়েন্টস্‌ম্যান্‌, আমারও ইজ্জত আছে, যদি তার দাম পাই···"

"কত?" প্রশ্ন করলাম আমি, বললাম—"কুলি হলে আনা দুইয়ের বেশি হত না তো।"

"চার আনা দেবেন বাবু আমায়!"

ইজ্জত জিনিসটা যে এত সস্তার হবে আশা করিনি, ভেবেছিলাম অন্তত একটা টাকা দাবি করবে, প্রস্তুতও ছিলাম, বললাম—"নে, তোল্‌।"

প্যাটফরম্‌ পেরিয়ে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করতে গিয়ে একটু

বাধায় পড়ে যেতে হল। একটি ভদ্রমহিলা একটা দোর ঘেঁষে চৌকাঠের পাশেই বসে আছেন বাইরের দিকে চেয়ে। কুলিটাই আগে ছিল, একটু দ্বিধাগ্রস্তই হতে হল, বললাম—"বারান্দাতেই নামিয়ে রাখ এক পাশে।"

ভদ্রমহিলা মৈথিল ভাষাতে কুলিটাকেই বললেন—"ভিতর যেইথিন্ তো যাউৎ ন"—অর্থাৎ ভেতরে যেতে চান তো যান না।

দোরটা আর একটু চেপে পাশ কেটে বসলেনও।

এই একটি ঘর। বাইরে তাপটাও বেশি, আমি আর অতটা চক্ষুলজ্জার দিকে গেলাম না। উনি ডানদিক ঘেঁষে বসেছিলেন, আমি কুলিটার পেছনে পেছনে বাঁদিক ঘেঁষে ভেতরে চলে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম। পয়সা নিয়ে কুলিটা চলে গেলে ভদ্রমহিলা আমার দিকে একটু ঘুরে বসে কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে প্রশ্ন করলেন—"আপনি তো বাঙালী?"

জানালাম—হ্যাঁ, বাঙালীই আমি।

মৈথিল ভাষাতেই জানালাম, এবং আমার অনুমান, বোধ হয় সেইজন্যই ভালো করেই ঘুরে দোরে পিঠ চেপে বসলেন উনি। বেশ সপ্রতিভ প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"চমৎকার মৈথিল ভাষা বলতে পারেন তো, কোথায় শিখলেন?"

সোজা চোখ তুলে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন। আমি বরং বেশ খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছি। আমার অবশ্য বয়স হয়েছে, তবু ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক, স্বজাতিও নয়, সে যে এই পরিবেশে এত অন্তরঙ্গ আলাপ জুড়ে দেবে এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু উত্তর তো দিতেই হবে; যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেই বললাম, "এখানেই।"

"এখানেই থাকেন?"

"না।"

"তবে?"

"দ্বারভাঙ্গায়।"

"দ্বারভাঙ্গায়? তাহলে তো দেখছি আমারই দেশের লোক আপনি।" বেশ উৎসাহিত হয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসলেন, বললেন—"জয়নগরের—রামকে চেনেন নিশ্চয়, বেশ বড় আড়ৎদার। আমি হচ্ছি তাঁর ভাইঝি।"

উত্তর করলাম—"না, চেনা নেই। আমি থাকি দ্বারভাঙ্গা শহরে। জয়নগর তো অনেক দূর।"

"দ্বারভাঙ্গাতেও তাঁর কারবার আছে, বেশ নামী লোকই আমার কাকা। সবাই জানে তাঁকে। মস্ত বড় ব্যাপারী যে।"

আজকের দিনটা কি পদে পদে এইভাবে বোকা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যই? অবশ্য বলা চলত, আমি বাঙালী, কেরানি জাতের মানুষ, নিতান্তই আদার ব্যাপারা, জাহাজ, অর্থাৎ কারবারীদের খবর রাখি না। কিন্তু ও প্রসঙ্গ বাড়াতে আর সাহস হল না। একটু অজ্ঞতার লজ্জিত হাসি হেসে, কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—"আপনি তাহলে মাড়োয়ারী, তা আপনিও তো চমৎকার মৈথিল ভাষা বলেন দেখছি।"

"কী যে বলেন। আমি মৈথিল বলতে পারব না? আমার মাড়োয়ারী কথা শুনেই বরং লোকে হাসে।"—চোখে মুখে কৌতুকের হাসি নিয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

বললাম—"বুঝলাম না তো। কারণটা কি?"

"খজৌরির নাম শুনেছেন? জয়নগর থেকে নেপাল সরকারের যে ছোট রেলের লাইনটা জনকপুর গেছে তারই একটা স্টেশন। এখন বোধ হয় মাড়োয়ারী বেড়ে থাকবে কিছু, কিন্তু আমাদের সময় আমরা একেবারে একটি ঘর। তাতেও লোক বেশি নেই; বাবা, মা, আমি আর আমার ঠিক ওপরে একটি ভাই, সে আবার মারাও গেল। চারিদিকেই তো মৈথিল, খেলার সাথী বলুন, প্রতিবেশী বলুন, দোকানের খদ্দের বলুন সবই তো মৈথিল, নিজের ভাষা বলি কার সাথে? বলবেন—কেন, বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন…

বললাম—"সত্যিই তো।"

"সে বড় মজার কথা; তাহলে বলি শুনুন। মা ছিলেন আমার খাস মাড়োয়াড়ের মেয়ে। একমাত্র তাঁরই চেষ্টা ছিল বাড়িতে নিজেদের ভাষাটা কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা। গোড়ায় গোড়ায় সব্বার সঙ্গে ঐ ভাষাতেই আরম্ভ করলেন। কিন্তু তা চলবে কেন বলুন? কিছু মাড়োয়ারী থাকলে লোকে শুনে শুনে তবু আন্দাজে একটু-আধটু বুঝে নেয়, খজৌরি তো সেদিক দিয়ে পরিষ্কার। শুধু যে কাজের অসুবিধা হতে লাগল তাই নয়। বাড়িতে একটা ঝি ছিল কাজকর্ম করবার জন্যে, এক নম্বরের হারামজাদা, আমাদের দেখা শোনা করবার জন্যে তার একটা মেয়েও ছিল, মায়ের মতনই শয়তান, জেনেশুনে কাজ পণ্ড করতে লাগল।...আপনি সেই বদ্‌মাসবা আর হারামজাদবার গল্পটা জানেন?"

এর মধ্যে কখন কি ভাবে একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে বড় গোছের। আমার সেই সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গিয়ে কখন যে একজন উৎকর্ণ শ্রোতা হয়ে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি। আসল কথা এত চমৎকার মৈথিলকথা, অনেকদিনই শুনিনি। একে মিঠে সুরেলা ভাষাই, তায় স্ত্রীকণ্ঠ, অপূর্ব লাগছে। প্রগলভা দেখে এক সময় যে কথা কমিয়ে আনবার চেষ্টা ছিল, সেটা গিয়ে এখন যেন বকাবার ঝোঁকই এসে গেছে। হারামজাদবা-বদমাসবার গল্প, দুটো বজ্জাত লোকের গল্প। গৃহস্থের বাড়িতে চাকরি ধ'রে ভাষার সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে। কতকটা আমাদের ছেলে-বেলায় 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি' গল্পটার মতো। জানা গল্প তবু ভদ্রমহিলার মুখে মৈথিলীর স্রোত বহাবার জন্যে বললাম—"না, কৈ জানা নেই তো।"

"তাহলে শুনুন"—বলে আরম্ভ করে দিলেন।

সে যে কী মিষ্টি কি ক'রে বোঝাই? রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা" গল্পটা মনে আছে তো? কবি দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের

শিলাতলে বসে বদ্রাওনের নবাবজাদীর আত্মকাহিনী শুনছেন।…
"বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের ছন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ …"

এও যেন অনেকটা সেই ধরনের। সে যেমন ছিল "আমিরের ভাষা", এ তেমনি কবির ভাষা, বিদ্যাপতির ভাষা। আর একটা জিনিস যা ছিল তার জন্যে বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর ভাষার চেয়ে বোধ হয় খজৌরির অমুক রামের ভ্রাতুষ্পুত্রীর ভাষাতে অধিকতরই মাধুর্য এনে দিয়েছিল। তাঁর ছিল একটি বিষাদ সমাচ্ছন্ন জীবনের কাহিনী; বেদনাময় গম্ভীর। এঁর কাহিনীটা নিতান্তই লঘু, চটুল একটা কৌতুক কাহিনী, যার জন্যে মাঝে মাঝে খানিকটা তরল হাসি ছলকে উঠে সমস্ত বাক্যস্রোতটিকে করে দিচ্ছিল সঙ্গীতময়। জলতরঙ্গ কথাটাকে এত সার্থক হয়ে উঠতে খুব কম দেখেছি। নবাবপুত্রী ছিলেন বিষাদময়ী, আত্মসমাহিতা; তার জায়গায় এঁর প্রগলভতাই যেন আরও উপভোগ্য করে তুলেছিল এঁর কাহিনীটিকে। হালকা সুরের সঙ্গে তাল মানাবে কেন? গল্পটা শেষ হলে ভদ্রমহিলা পূর্বকথায় ফিরে এলেন। একটি তরল হাসির পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে একটু যেন দম নিলেন, তারপর বললেন—"আমার মার কথা যা বলছিলাম, ওঁর সেই নিজের ভাষা চালাবার ঝোঁক। ঝি আর সেই মেয়েটার কাছে ভাষার গোলমালে কয়েকবার নাকাল হয়ে—মেয়েটাতো মায়ের শেখানো মতোই চলছে—নাকাল হয়ে ছেড়ে দিলেন ওদিকটা। বাকি রইলেন বাবা…"

এবার ঘাড় উলটে একটু বেশি করেই হেসে উঠলেন, তারপর বললেন—"বাবা আমার ছিলেন ভালোমানুষ। প্রথমটা মন জুগিয়েই চললেন মার, কিন্তু এমনই উঠে পড়ে গুরুগিরি লাগালেন মা যে তিনিও শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। ওঁর রোগ হল কথায়

কথায় ভুল ধরা। তাও এমনি নয়, পাঠশালার পোড়োর মতন দাঁড় করিয়ে কয়েকবার বলিয়ে নিয়ে তবে ছাড়তেন। বাবা ভয়ে বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলেন, এলেও কথা কমিয়ে দিলেন। আমাদের তখন রগড়টা বুঝবার বয়েস হয়েছে, দেখতাম—বাবা কিছু নিতে বা অন্য কোন কাজে বাড়িতে ঢুকে যেই দেখলেন যে মা দাওয়ায় কিম্বা উঠানে দাঁড়িয়ে, অমনি যেন চোরের মতো একটু এদিক ওদিক করে সরে পড়লেন। মাকে দেখতাম যেন বাজ-পাখীর মতন ওত পেতে আছেন। এই করে যেতে যেতে একদিন একটা কথার উচ্চারণ নিয়ে দুজনে লেগে গেল। বাবা সেদিন যেন লড়াইয়ের জন্যে তৈয়ের হয়েই এসেছিলেন, নিজের বাড়িতে লোকে এভাবে কতদিন কাটাতে পারে বলুন না—নিজের স্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে। একটা গালভরা খাস মাড়োয়ারী কথা—তার বানান-উচ্চারণ দুরুস্ত করে নিয়ে কি একটা কথা প্রসঙ্গে ঝেড়ে দিলেন মার কাছে। বললেনও এমনভাবে কথাটার ওপর জোর দিয়ে যে মা একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবটা যেন—চেলা হঠাৎ এমন গুরুমারা বিদ্যে শিখে এল কোথা থেকে।

বললেন—"কি বলছ একটু ঠিক করে বলো।"

বাবা বললেন—"ঠিকই বলছি, তুমি তোমার বুদ্ধির মতন করে শুধরে নিয়ে বুঝে নাও।"

বইয়ের জোর আছে এদিকে মেয়েরা কেতাবের সব কথাগুলো তো ঠিকভাবে উচ্চারণও করে না, তায় কথাও বেছেছেন বাবা তেমনি দেখে, মা ভেবে নিয়ে বললেন—"তুমি বোধ হয় এই কথা বলছ মকাই আর মেড়ুয়ার দেশের ভাষার মতন করে।"

বাবা বললেন—"থাক, বালি, জওয়ার আর বাজরার দেশের খুব পরিচয় দিয়েছ একটা মামুলি কথার এই উচ্চারণে।"

"এই উচ্চারণ আলবৎ।"

"কক্ষণও নয়।"

"আলবৎ। তোমার দফা সেরে দিয়েছে। ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে চলো। তাও দেখো যদি ঢুকতে দেয় সেখানে।"

বাবা আর কিছু না বলে গটগট করে বাইরে চলে গেলেন। এত বাড়াবাড়ি কখনও হয় না, আমরা দুজনে দাওয়ার এক কোণে ভয়ে গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছি একখানা বই হাতে করে ; বাবা আবার ভেতরে এলেন। পাতাটায় আঙুল গোঁজাই ছিল, "আরে দেখ্‌খো শেঠিন" বলে মায়ের চোখের নীচে ধরতেই মা বইখানা ছিনিয়ে একেবারে উঠানের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

আটদিন একেবারে কথা বন্ধ রইল দুজনের মধ্যে তারপর একদিন বাবা…"

"আরে, আপনি এখানে কি করে!"

ঘাড় তুলে দেখি চৌকাঠের পাশে বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বেহারী বলেই বোধ হল, চেনা মুখও, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক ধরতে পারছি না। প্রায়ই এই রকম হয়, বয়সের সঙ্গে আজকাল একটু বেড়েছেই বরং, তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যিনি বয়স দিয়েছেন বাড়িয়ে তিনিই কৃপা করে সামলেও দেন। একটু যে থতমত খেয়ে গেছি তার মধ্যে উনিই বললেন—"আমায় চিনতে পারছেন নিশ্চয়। আমি হচ্ছি কমলের বাপ। দ্বারাভাঙ্গায় আপনাদের পাশেই বাড়ি ভাড়া করে আছি আমরা…"

বললাম—"বিলক্ষণ। আপনাকে চিনব না? অত পরিচয় দিতে হবে?, কমল সর্বদাই বাড়িতে যাতায়াত করছে, আমার ভাইপোর বন্ধু—বাড়ির ছেলের মতনই। তা আপনি হঠাৎ এখানে?"

"আমি এখানে স্টেশন মাস্টার যে। আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারেননি এখানে দেখবেন?"

"মোটেই নয়।"

"তাই মনে হল—যেমন দেখেই হকচকিয়ে গেলেন দেখলাম।"

যাক হকচকিয়ে যাওয়ার জবাবদিহিও ওদিক থেকে পৌঁছে গেল।...নামটাও জিগ্যেস করবার আগে আপনিই বললেন—। নিশ্চিন্দি। যে ধরনের কাজ, সে হিসাবে মানুষটি বেশ একটু বেশীই মিশুকে এবং আলাপী বলে মনে হ'ল।

আসল কথা স্টেশন মাস্টাররা—শুধু স্টেশন মাস্টার বলি কেন, স্টেশন সংলগ্ন মানুষ মাত্রেই বড় স্টেশন-বদ্ধ। ঐখানেই ওঁদের সমাজ, ঐখানেই ওঁদের সব কিছু। ঐটুকু বৃত্তের বাইরে ওঁদের বড় একটা পাওয়া যায় না। খুব স্বাভাবিকও, যে ধরনের সর্বদা সামাল-সামাল কাজের ধারা, ছুটিছাটার জন্যেও অসুখে পড়তে হবে, বা অসুখের নাম নিতে হবে ; নয়তো পালেও নেই, পার্বণেও নেই। মেশবার সুযোগ কোথায় যে মিশবেন ?

নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রমটাই হ'ল—চিত্রশিল্পীর ভাষায় বলতে গেলে হাই-লাইট (High light) ; দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী, মনের মধ্যে জেঁকে বসে। বেশ ভালো লাগল। অনেকটা একতরফা হলেও ভদ্র-মহিলা আমার বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে যে আলাপের মুডে mood এনে ফেলেছিলেন,—বাবুকে পেয়ে খুশীই হলাম। অপরিচিত স্ত্রীলোক বলে একটা সঙ্কোচের বেড়া তো ছিলই দাঁড়িয়ে মাঝখানে।

আরও দু'একটা প্রাথমিক কথার পর—বাবু বললেন—"তা আপনি এখানে এভাবে বসে থাকবেন ? আসুন আমার ঘরে।"

হাঁক দিয়ে লোক ডাকতে সেই ইজ্জৎ-দার পয়েন্টসম্যানটাই এল। জিনিসগুলা নিয়ে যাওয়ার সময় একটা করুণ দৃষ্টিতে সে চাইল আমার দিকে তার কারণ নিশ্চয় এই যে, চার গজের মেহনতের জন্যে চার আনা আদায় করার কথাটা যেন ফাঁস না করে দিই, ফেরত না দিতে হয়, ইজ্জতের পয়সা ক'টা।

এঁকে দেখে ভদ্রমহিলার সঙ্কোচের ভাবটা তেমন কিছু বাড়েনি, মাথার কাপড়টা আরও আঙুলদুয়েক নামিয়ে দিয়েছেন মাত্র। বললাম —"আমি আসি তাহলে। বড় চমৎকার লাগছিল আপনার কাহিনীটি।"

একটু হেসে বললেন—"শেষটা তো শুনলেন না, সে আরও মজার।"

আর থাকা চলে না ভাঙা আসরে। বললাম—"সত্যি নাকি? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, শেষ পর্যন্ত না থাকাই ভালো কিন্তু তার মধ্যে, নয় কি?...তাহলে আসি, কি বলেন?"

বেশ খিলখিল করেই হেসে উঠলেন, বললেন—"যেমন-তেমন ঝগড়াও নয়।...বেশ, আসুন।"

কপালে হাত তুলে বললেন—"নমস্তে।"

ঐ সঙ্গে—বাবুকেও নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বললেন—"বহীনজীকে কিন্তু শীগ্গির শাগ্গির আনিয়ে নিন মাস্টারবাবু। যতই ঝগড়া হোক, দুলহা দুলহীন (বর কনে) এক সঙ্গে থাকেন সেই ভালো।"

"তাতো বটে"—নৈলে শাক্ত-বৈষ্ণবে এত মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে কি করে?" দুজনের মধ্যে একটু যে হাসি উঠল তার তাৎপর্যটা বুঝতে পারলাম না। আমরা স্টেশন ঘরে এসে বসলাম।

মনে যে ধোঁকাটা লেগেছিল তার কথাটাই আগে তুললাম, প্রশ্ন করলাম—"ভদ্রমহিলা আপনাকে চেনেন দেখছি। আচ্ছা, মাথায় কিছু ছিট আছে কি?"

একটু যেন অদ্ভুতভাবেই আমার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসলেন, বললেন—"আছে, এবং আপনাদের মতন সঙ্গী পেলেই সেটা বাড়ে।"

"বুঝলাম না তো।"—বিস্মিতভাবে চাইলাম আমি।

"আপনি তো বেশ মৈথিল ভাষা বলতে পারেন। ঐটেই ওঁর মাথার ছিট।"

সেই রকম রহস্যজনকভাবে হেসেই বললেন কথা কটা। তারপর প্রশ্ন করলেন—"উনি যে মৈথিল নয় সে কথা বলেছেন আপনাকে?"

"হ্যাঁ, একজন মাড়োয়াড়ী শেঠের মেয়ে।"

"কিন্তু মানুষ হয়েছেন একেবারে মৈথিলদের মাঝখানে, জনকপুরের কাছে। তারপর বিয়ে হয়েছে, মজঃফরপুর থেকে এগিয়ে গোটা তিন স্টেশন পরে একটা জায়গায়। স্টেশনের কাছাকাছি ওঁর স্বামীর একটা আড়ৎ আছে। অবস্থা বেশ ভালোই, বাড়িঘর, বাগান, লোকজন; কিন্তু জীবনে সুখ নেই ভদ্রমহিলার..."

"কেন?"—আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

"যেহেতু সেখানে মৈথিল কথা বলবার বা শোনবার সুযোগ নেই। অন্তত উনি তাই বলেন আমাদের। আর, কথাটা মিথ্যেও নয় মোটেই। কি যে ভালবাসেন এই মৈথিল ভাষা! একটু বলবার জন্যে, একটু শোনবার জন্যে সে যে কি আকুলি-বিকুলি, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমাদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ঐ মৈথিল ভাষা নিয়েই। আমি অবশ্য ছাপরা জেলার করণ-কায়স্থ, তবে আমার স্ত্রী হচ্ছেন মিথিলার মেয়ে। অনেকটা ওঁর মতনই। আমার শ্বশুর বালিয়া জেলা থেকে উঠে গিয়ে দ্বারভাঙ্গার কাছাকাছি সোহো-ডুমরী বলে একটা গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন, শ-খানেক বিঘে জমি নিয়ে। আমি তখন ওঁদের স্টেশনে বসেছি, একদিন গাড়িতে আসতে ওঁদের দুজনের আলাপ হয়। তারপর থেকেই ঘনিষ্ঠতা। সেদিন থেকেই বলা ঠিক বরং, ভুলব না আমি সেদিনের কথা। সন্ধ্যের পর স্টেশন থেকে বাড়িতে গিয়ে পা দিতেই কানে এল বিদ্যাপতির গান। শোনা গান একটা, মহাদেবের বিবাহের। আমার শ্বশুর বাড়ি তো ঐদিকেই। আগে আগে যখন যেতাম পাড়ার মেয়েরা জোট বেঁধে গাইতো আশে পাশে দাঁড়িয়ে, ওদিকে ওটা চলে তো। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এখানে হঠাৎ এল কি করে! আর একজনের গলা নয়। আমার স্ত্রী রয়েছেন, আর একটি অপরিচিত কণ্ঠও...গাইছেন..."

আবেগের সঙ্গে কাহিনীটা বলতে বলতে হঠাৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেলেন—বাবু, আমি হেসে বললাম—"বলুন না, জানা থাকে তো। বিদ্যাপতিরই গান বলছেন যখন।"

"সবটা মনে নেই, অনেকদিন আগে শোনা তো। গোড়ার দিকটা হ'ল—

'বিবাহে চলল শিবশঙ্কর, হর ভঙ্কর হে। মাই হে করে লেলে ডমরু বাজাবত'। 'শিরে শোভে বিথধর (বিষধর) হে...'

আমার একটা কি বিশেষ দরকার ছিল। এদিকে একটা মালগাড়ির লাইন ক্লিয়ার দিয়ে এসেছি, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি ঘুরে চাইলেন। মাড়োয়াড়ীদের পর্দা প্রথাটা ঠিক আমাদের মত নয় এটা জানেনই, তার ওপর প্রথম পরিচয়েই লক্ষ্য করে থাকবেন পুরুষ দেখলেই যে একটা বাড়াবাড়ি সঙ্কোচ এসে পড়বে, সে ভাবটা নেই ভদ্র মহিলার। উনি বেশ সোজাসুজিই আমায় দেখে নিলেন, তারপর আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"পাহুন ?"

...কথাটার অর্থ আপনি জানেনই—ভগ্নীপতি অর্থাৎ ওঁর ভগ্নাপতি আর কি। আমার স্ত্রীর তো বোন হয়েছেন উনি। আমার স্ত্রী মাথা দোলালে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন—"নমস্তে।" তারপর একটু হেসেই বললেন—"আপনি আমাদের দেশের জামাই, বহীনজীর দুল্‌হা, লজ্জা শরম করতে পারব না আমি; বলে রাখলাম।"

আমার স্ত্রী পরিচয় দিলেন। সেই থেকে যাওয়া-আসা আমার বাড়িতে। দুই তরফ থেকেই। দিনে একবার করে দেখা হওয়া চাই-ই, কোনও বাড়িতে। স্ত্রীর ফুরসত না রইল ওঁকে ডেকে নিলেন, ওঁর ফুরসত না রইলো স্ত্রীকে ডেকে নিলেন। কথাবার্তা মৈথিলিতে। আমার কাছে গোড়া থেকেই কোন সঙ্কোচ নেই। স্বভাবটাও মৈথিল মেয়েদের মতন। মৈথিল 'মেয়েরা একটু বেশি রঙ্গ-প্রিয়, পাতান সুবাদ ধরে প্রায়ই এক আধটা বিদ্রূপের ঝাপটাও এসে পড়ে আমার ওপর', একটা নমুনা তো শুনলেন এখুনি।'

একটু হাসলেন—বাবু।

বললাম—"স্বভাবটা বড় মধুর বলে মনে হচ্ছে এখন। বুঝতে পারিনি, ভাবলাম হয়তো দোষ আছে মাথার।"

"তার কারণ, একেবারে অরিজিনাল (Original) চরিত্র তো। আপনিও তো ওদিককার মানুষ, মনে হয় না মিথিলা আর মাড়োয়ার একত্র হয়ে মিলেছে ওঁর মধ্যে ?"

বললাম—"আমার তো বরং মনে হয় মিথিলা মাড়োয়ারকে গ্রাস করে ফেলেছে।"

—দুজনেই হেসে উঠলাম। আমি প্রশ্ন করলাম—"তা এখানে হঠাৎ—এভাবে ?"

বললেন—"বদলি হয়েছি, দূরত্বটা বেড়েছে, কিন্তু অভ্যেসটা যায়নি ওঁর। শুধু ওঁরই বা বলি কেন, কমলের মাকেও তো একেবারে দলে টেনে নিয়েছেন। আর দৈনিক হওয়ার যো নেই, তবে, হপ্তার মধ্যে অন্তত বার দুই দেখা হওয়া চাই-ই। কখনও উনি গেলেন, কখনও ইনি এলেন। একটা কি দুটো ট্রেন ছেড়ে দিয়ে মৈথিলী চর্চা হয়। একদিন রুকমিনী দেবী বললেন (ওঁর নাম রুকমিনী)—"পাছুন এমন মাস্টার ঘরে, কি ছাপরাইয়া বুলি নিয়ে পড়ে আছেন ? 'আবৎ হৈ—জাৎবানি'—শিখে ফেলুন আমাদের মৈথিল ভাষা। আমি জবাব দিই—"হ্যাঁ, বড়কী বহীন, শেঠজীর ভাষা তো আরও কড়া—'কট্টো গয়ো ?—কীদ্রি আয়োহেঁ—' মাস্টার তো আরও ভালো, তাঁকে শাকরেদ করবার কি করছেন ?" উনি একেবারে হাত তুলে শিউরে উঠলেন, বললেন—'গুরুগিরি করতে গিয়ে বাবা-মার মধ্যে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের মেয়ে হয়ে আমি আর ওদিক মাড়াচ্ছি আর কি !

সে গল্প করেছেন উনি আপনার কাছে ? অনেকক্ষণ ধরে তো কথা হচ্ছিল।"

হেসে বললাম—"করছিলেন সেই গল্প, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।…তা উনি এখানে ওয়েটিং রুমে বসে যে একলা ?"

"আমার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে একটা খবর পেয়ে হঠাৎ আজ সকালে চলে যেতে হল। খবরটা স্টেশনে ফোন ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলাম শেঠজীকে, জানালেন—তার আগেই রুকমিনী দেবী বেরিয়ে পড়েছেন।"

আমি যে একটু প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইলাম তার উদ্দেশ্যটা বুঝে বাবু বললেন—"ও, বুঝেছি, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এ বিষয়ে খুব লিবারেল আইডিয়ার (Liberal Idea)—একলাও যে না আসেন এমন নয়, যদিও প্রায়ই একজন লোক সঙ্গে থাকে, চাকর, গদির মুনিম, যেই হোক। নিজেও ক্বচিৎ কখনও সঙ্গে এলেন। ব্যবসাদার মানুষ, সবসময়ে পারেন না। সন্তানাদি কিছু হয়নি এঁদের। সেদিক দিয়ে ঝাড়া হাতপা। উনিও এসেছেন এই গাড়িতেই। সোজা নেবেই আমার বাসায় চলে যান ঐদিক দিয়েই; ইতিমধ্যে ট্রেনটাও ছেড়ে যায়। ওদিকে গিয়ে দেখেন—বাড়ি খালি আমার।"

"তাই মনমরা হয়ে বসে আছেন এখানে?"

"তা আর হতে দিলেন কোথায় আপনি?"

এরপর আপনার গল্পই চলবে কতদিন—বাঙালী এমন মৈথিলী বলতে পারেন, একটা দুর্লভ আবিষ্কার তো। বলে কুলিয়ে উঠতে পারবেন উনি কখনও ভেবেছেন?"

"অ্যাঁ, কি বললেন?"—অযথা প্রশ্নটা যে করলাম তার কারণ 'দুর্লভ আবিষ্কার'—কথাটা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। লেখক মানুষই তো—দুর্লভ আবিষ্কারের আশায়ই দুনিয়া ঘেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।····পেয়েছি এমন কটা?

ওঁকে নিয়েই কথাবার্তা চলল আমাদের। বাসায় কমলের মা নেই, কাজেই রুক্‌মিনী দেবী স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে আছেন একা। এসেছেন এবার ওঁদের গদির বৃদ্ধ মুনিমকে সঙ্গে করে। তার বাড়িও এখানেই কাছাকাছি একটা গ্রামে, ঘুরে আসতে গেছে নিশ্চয়। ওঁর গাড়ির এখন দেরিও আছে।

—বাবু মাঝে মাঝে এসে কথা কয়ে যাচ্ছেন একটু-আধটু তবে, কাজ রয়েছে, অভিন্ন যদিও শেঠজী আর এঁদের দুটি পরিবারে সব দিক দিয়ে এক পরিবারের মতই হয়ে গেছে, তবু সদর জায়গায় বসে বসে তো একটানা গল্প করা যায় না।

চায়ের কথা বলে দিয়েছিলেন, পয়েন্টস-ম্যানই তৈরী করে নিয়ে এল। দু'কাপ। হয়তো মনটা বেশি করেই রুক্মিনী দেবীর দিকে থাকায় আমি প্রশ্ন করলাম—আর উনি,—খান না চা?

বললেন—"না, আমাদের বাড়িতে জলস্পর্শ করেন না।"

"সে কি! বলছেন প্রায় এক পরিবার..."

"আমরা যে মাছ খাই।"

এমনভাবে কথাটা বলে ফেললেন, দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম।—বাবু বললেন—"আরও আছে। শেঠজীর কিছু বাছ-বিচার নেই, অবশ্য মাছটা আর খান না..."

"বনে কি করে দুজনের?"

বাবু একটু গূঢ় হাসি নিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন, বললেন—"কমলের কাছে শুনেছি আপনি অবিবাহিত...বনে কি করে বললে বুঝবেন কি কথাটা?"

এবার একটা ছাত ফাটানো হাসি উঠল। বললেন—"তখন যে আমি ওঁর ঠাট্টাটা ফিরিয়ে দিলাম- 'শাক্ত-বৈষ্ণবের' মাখামাখির কথা বলে, তার ভেতর এই কথাটাই ছিল। আরও বলি ওঁকে—"বড়কী বহীন, আপনার রক্তে দাম্পত্য-কলহের বীজ আছে—পিতাজী আর মাতাজীর যেমন গল্প করেন, সুতরাং সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? শেঠজী দয়া করে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁকে কড়া বৈষ্ণব করে নেওয়ার কথা বলব না নিজের মতন; আমি বলি আপনিই বরং একটু শক্ত হয়ে যান, গরমিলের ভয়টা কেটে যাবে।"

উনি বললেন—"পাছন, আমার মা বাবাকে শেষ পর্যন্ত কি রকম নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিলেন সেটাও তো দেখা আছে।

সুতরাং ধরে নিতে পারি না কি, সে শক্তিটাও আছে আমার রক্তের মধ্যে ?"

শরৎ-শেষের মুক্ত আকাশ থেকে রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে। সরু পায়ে হাঁটা পথটা মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে এসে যেখানে খানিকটা ফলাও হয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেছে, সেইখানে, একটা কদম গাছের শেকড়ের ওপর ছায়ায় বসে আছি আমি। এখন আমার আলাপে সঙ্গী পল্টু মুসহর্। গ্রাম বললাম ?... ঠিক গ্রাম নয়, তবে কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাই না, বড় মিষ্টি এই শব্দটা। এই রাস্তাটা আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে একটা যে কাঁচা সড়কে উঠে গেছে, সেই দ্বিভুজের মাঝখানটিতে গোটাচার বাড়ি, কোনটিতে একটি, কোনটিতে দুট ঘর, দুটির বেশ কোনটিতেই নেই। কঞ্চির ওপর কাদা লেপে দেয়াল, খড়ের চাল, সবগুলিতেই সজ্‌মন্ (লাউ) আর ঘিউরার (ধুধুল) লতা ছেয়ে ফেলেছে। ঘিউরার বড় বড় হলদে রঙের ফুলে সমস্ত জায়গাটা ঝলমল করছে। ...আমায় এখন লক্ষ্ণৌয়ে শাহী পার্কে নিয়ে যেতে চাইলে যাব না।

যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ সবুজ আর সবুজ। ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে অশ্বত্থ গাছ, একটাই, বা গোটা তিন চার এক সঙ্গে, একেবারে দূরে দিকচক্রে এখানে ওখানে বোধ হয় ওগুলো আমবাগান। সমস্তটুকুর ওপর ঘন-নীল আকাশ—যেন বুকের মধ্যে নিয়ে আগলে রয়েছে সবগুলোকে।

ধানের এমন রূপ দেখিনি আগে। সরু রাস্তাটুকু দিয়ে আসতে দুদিক থেকে গায়ে এসে পড়ছে। অন্নরূপা জননীর যেন হাত বুলিয়ে দেওয়া গায়ে। সমুদ্রমন্থনে যে লক্ষ্মী উঠেছেন তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করছি এখানে। ঋতুতে ঋতুতে তাঁর নিত্য উদয় চলছে—আজ এখানে, কাল অন্যত্র, ঋতুচক্রের জগদ্ব্যাপী নিত্য আবর্তনে। এই দিগন্ত-প্রসার হরিৎ-সমুদ্র ভেদ করে উঠছেন মা। মাথায় ওটা স্বর্ণমুকুট,

মায়ের মাথায় স্বর্ণমুকুট সে তো সোনার ফসলেই হবে। নিরর্থক ধাতু-স্বর্ণের মুকুট—সে অন্য কোন দেবতা মাথায় দিন।

আমি নাকি পঞ্জিকা-বিরুদ্ধ অযাত্রায় বেরিয়েছি? তাহলে আকাশ জোড়া এই শোভাযাত্রার মাঝে এসে পড়লাম কি করে? এত ভুলের মধ্যে দিয়ে, এত ঘোরা পথে, এত লজ্জা-সঙ্কোচ-বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে?

থাক ওসব কথা, কিছু বোঝা যায় না। যাত্রা হয়ে উঠেছে অযাত্রা, অযাত্রা হয়ে উঠছে যাত্রা—এই তো দেখে এলাম সারা জীবন ধরে।

একটু গোড়া থেকেই বলি। গল্পের মধ্যে তখন—বাবু বলে উঠলেন—"সে সব বড় ইণ্টারেস্টিং কাহিনী ওঁর। কিন্তু আমার আসল কথাটিরই জবাব পাই নি এখনও। এখানে আপনি হঠাৎ যে!"

যে মিথ্যাটি চালিয়ে এসেছি এ পর্যন্ত, ভুলের লজ্জা চাপা দেওয়ার জন্যে, সেটা এঁর কাছেও চালানো ঠিক হবে কিনা ভেবে সেকেণ্ড কয়েক দ্বিধাগ্রস্থ থেকে একটু হেসে বললাম—"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্যটা আজ কপালে লেখা ছিল নিতান্ত।"

"সেটা আমার সৌভাগ্য নিশ্চয়, কিন্তু আপনার কি করে হতে পারে, বুঝছি না তো মুকুর্জিবাবু......তবু বলুন, যদি কিছু সেবা হয় আমার দ্বারা।"

"সেবা নয়। তবে অনুগ্রহ একটা করতে পারেন আপাতত—টিকিট না চেয়ে। আপনার স্টেশনে অনধিকার প্রবেশ করেছি আজ।"

পকেটে হাত দিয়ে টিকিট বের করে হাতে দিলাম। দেখে নিয়ে বললেন—"পাটনা!—মজঃফরপুরে গাড়ি গোলমাল করে ফেলেছেন নিশ্চয়—কিম্বা সমস্তিপুরেই। এইরকম হচ্ছে হঠাৎ গাড়ির কতগুলা রদবদল করে—প্রায়ই এসে নামছে দু একজন করে।"

আমি যে ঠিক তাদের দলের নয়, এখানে না এসে পড়বার যথেষ্ট সুযোগ নিজের দোষেই নষ্ট করেছি সেটা আর ভাঙলাম না। থাক না কথাটা ওঁর কাছে ঐভাবেই। প্রতিবেশী মানুষ, একেবারে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত চারিয়ে দেওয়ার দরকার কি?

বললাম—"দেখুন না, দুর্ভোগ। আমার পাটনা যাওয়ার গাড়িটা এই সন্ধ্যের সময়ই মজঃফরপুর থেকে ছেড়ে যাবে। ওটা ধরবার আর উপায় নেই বোধ হয় কিছু?

চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, বললেন—"দেখছি না তো কিছু আপাতত। ক্যালক্যাটা প্যাসেঞ্জারটা ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছে। আর তো……

আমার মনে পড়ে গেল হঠাৎ। প্রশ্ন করলাম—"মালগাড়ী নেই কোন তার আগে—শুনেছি ফার্স্টক্লাসের ভাড়া দিয়ে যাওয়া যায় তাতে, গার্ডের সঙ্গে।"

এতক্ষণ ভুলে ছিলাম ওদিকটা, আবার মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবছিলেনই অন্যমনস্ক হয়ে—বললেন, "সেই কথাই ভাবছি। গেলে অবশ্য ভাড়ার কথা ওঠে না, ব্যবস্থা হয়েই যায়। কিন্তু কোন ইন্টিমেশন তো নেই মালগাড়ীর। দাঁড়ান দেখি খোঁজ নিয়ে।"

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার রেখে দিয়ে বললেন—থাক, হয়েছে, কেন যে মনে পড়ছিল না।—আপনি বাই রোড চলে যান না। রেলের পাশেপাশে গেছেই রাস্তাটা।

শিউরে উঠেই বললাম—"কিন্তু সে তো অন্তত ন' মাইল হবে!"

"না না, হেঁটে নয়!"—একটু হেসে বললেন—"হেঁটে যাওয়ার কথা বলব?—এমন কি তেপান্তরে পড়েছেন? মোতিহারী-মজঃফরপুর বাস সার্ভিস রয়েছে, আপনি বেরিয়ে পড়ুন।"

"বাসটা কখন?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

আন্দাজ করে নিয়ে বললেন—"এই সময় একটা ছিল্যো। হয়তো

বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাড়াহুড়ার দরকার কি? রোদটা বড্ড কড়াও। আপনি ধীরে-সুস্থেই চলে যান। আধঘণ্টা লাগে, পরেরটাতে গেলেও আপনি পাটনা গাড়ির জন্যে যথেষ্ট মার্জিন পাবেন।

একটা খালাসি দিলেন, সুটকেস, বেডিং, জলের কুজা আর ব্যাগটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আসবার সময় রুক্মিনী দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে এলাম।

একটু আটকে দিলেন উনি, বুঝলাম মৈথিল ভাষা তারও খানিকটা চালাবার জন্যেই।......ও, তাই নাকি?—গাড়ি ভুল করে চলে এসেছেন! গেরো!......তা এখন যাচ্ছেন কোথায়?...বাসে করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে? যায় নাকি পাওয়া বাস? কৈ আমায় বললেন না তো আপনি? প'হুন"

—বাবু বললেন—"অনেকটা পথ বডকী বহীন, তায় কড়া রোদ।—"

"শুনুন কথা ওঁর বাঙালীবাবু! আমি মা-জানকীর দেশের মেয়ে, পথ চলতে কাতর হব!—যেতামই, তবে মুনীম যে এখনও এলেন না।—আহা, চমৎকার সাথী পাওয়া গিয়েছিল—দেশের মানুষ—"

মুখের দিকে একটু যেন ব্যথিত দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলেন দীর্ঘ-পথের আলাপ, মৈথিলীতে, যেন কত বড়ই না একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

বললাম—"আচ্ছা নমস্তে, তাহলে আসি।"

একটু যেন চকিত হয়েই বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, আসুন, নমস্তে।"

সেই বেরিয়েছি স্টেশন ছেড়ে, তারপর ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইলটাক এসে এখানেই আটকে পড়েছি। ঠিক যে ক্লান্তি তা বলব না। খাবার দেখলে ভরা-পেটেও একধরনের ক্ষিদে এসে পড়ে না? এও কতকটা তাই।

তুমি বলবে সেরকম ক্ষিদে যে নেহাতই সেইরকম ঔদরিক, তারই আসে। খুব খাঁটি কথা। এবং আমার মনটাও এইরকম একটি ঔদরিকই, এইরকম খোরাকের সন্ধান পেলে পাগল করে ঘুরিয়ে মারে আমাকে। আর এটা তো জানো, দেহের উদরের চেয়ে মনের উদর অনেক বড়, চায়-ই না অল্পে ভরতে। স্টেশন ছেড়েই পেয়েছে যথেষ্ট খোরাক। শারদাকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে সে একরকম ভূরি-ভোজনই, ভরে যাওয়ার কথা উদরের; কিন্তু এই ছটাকখানেক ডোবার জলে হ্যালা ফুলের হুড়াহুড়ি, চারখানি ঘর নিয়ে এই গ্রাম (কে যেন খেলাঘরই পেতে বসেছে), আর, সব ঘরের চালে ধুঁধুল ফুলের হলুদ উৎসব, সব মিলে এ যেন পেটুকের কাছে নতুন নিমন্ত্রণের ডাক। কদম্বের ছায়া পেয়ে ক্লান্তি এল, কি নতুন নিমন্ত্রণে নতুন করে ক্ষিদের উদ্রেক, তা ঠিক কি করে বলি ? দুই যেন গেছে মিশে।

আর কি ক'রে বোঝাই বা তোমায় ?

কোথায় বসে পড়ছ আমার এ চিঠি তুমি ? তোমার আফিসের সিলিং পাখার নীচে ; টেবিল, চেয়ার, ফাইলের ভিড়ের মধ্যে একটু সময় চুরি করে ?...কিংবা তোমাদের বিডন রো'র সেই মেসের নীচের চাপ ঘরটিতে ? পাশেই কলের জলের কলরবের সঙ্গে বাসন মাজার ঝনঝন....

হয়তো বা সন্ধ্যার মুখে তোমাদের হেদো পার্কেই গিয়ে পড়ছ এইখানটা। ওর নতুন নাম হয়েছে নাকি আজাদ হিন্দ্ বাগ। আহা, ঐটুকু নিয়েই কত আমোদ-আহ্লাদ, নামেরই কত রদবদল, তাই নিয়ে কর্পোরেশনে কত কাটাকাটি ভোটাভুটি! আহা, অপুত্রকের রোগা ছেলে, নামের চাপেই সারা হলো। পার্কে তো এদিকে ঘাসের চেয়ে বেঞ্চি বেশি, বেঞ্চির চেয়ে তার খদ্দের বেশি ; সেখানে জলের চেয়ে সাঁতারু বেশি, সাঁতারের চেয়ে তার হুল্লোড় বেশি। তা হেদোই হোক বা নতুন নামেই হোক, সেখানে বসেই

বা কি করে বুঝবে, এখানে অল্প আয়োজনে এ কি রাজভোগ!...
আসল কথা কি জান? সৃষ্টির আদি থেকেই আমরা এত রাজা-রাজা করে মরলাম, এতদিন ঘর করলাম রাজার সঙ্গে, শেষে রাজার পাট উঠেই যেতে বসেছে, তবু কিন্তু আসল রাজা যে তখ্‌ৎ-তাউস্‌ ছেড়ে ঘাসের আসন বিছিয়েই কোথাও আছেন বসে এ খবরটা আজ পর্যন্ত পেলাম না। হয়তো ঐ জন্যেই, আসল ছেড়ে নকলের সঙ্গেই কাটিয়ে দিলাম তো সমস্ত দিন।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে খালাসীটাকে বললাম—"একটু জিরিয়ে নেব ভাবছি, অনেকখানি এলাম রোদে। আর আছে কতদূর?"

একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—"তা এখনও ক্রোশটাক আছে হুজুর। কিছু বেশিই বরং।"

"তাহলে বসেই যাই একটু। তুইও ওগুলো নামিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

এগিয়ে ওকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম, জিভ কেটে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—"সে কি হয় বাবু? আপনি শরিফ লোক, বড়াবাবুর দোস্ত্‌...আমি লোক ডাকছি।"

"পলটু হো! বাড়্‌-অ ঘড়মে?"

পলটু বেরিয়ে এল একেবারে শেষের লাটার মধ্যে থেকে। বেশ বিস্মিতই। খালাসী তাকে নামিয়ে দিতে বলল বোঝাটা।

না ডাকলেও পারত; এমন কিছু ভারি নয়। নামিয়ে কিন্তু গামছাটা দিয়ে এত ঘটা করে গা হাত ঝাড়তে লাগল, এত ঘটা করে শুকনো মুখের ঘাম মুছতে লাগল যে আমায় বলতেই হলো—"তোরও দেখছি বেশ মেহনত হয়েছে, একটা লোক পেলে না হয় ছেড়েই দিতাম তোকে। এ যেতে পারবে না?"

"খুব পারবে বাবু, এটুকু বোঝা, এ তো ওর জলপান।"—

একেবারে এতটা উৎসাহিত হয়ে কেন উঠল সেটা ওর পরের কথাতেই টের পেলাম, বলল—"আর একেও কিছু দিতে হবে না আপনাকে। পলটু হচ্ছে ই স্টিশনের ঠিকে খালাসী, বেশি মালটাল এলে নামাতে যায়।"

ওর দিকে চোখ বড় ক'রে চেয়ে বলল—"দেখিয় হো।…হুঁ।"

অর্থাৎ দেখো যেন লোভে পড়ে যেয়ো না।

গা-ঝাড়া দিয়ে ওকে গছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা টের পাওয়া গেল। 'বড়াবাবু'র দোস্ত আমি, আমার কাছে ওরও লোভ করবার কিছু নেই, মোট পৌছে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে যখন, তখন আর এত মায়া কেন?

পলটুকে আর একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়াতেই ডাকলাম—"শোন।"

ঘুরে দাঁড়াতেই পকেট থেকে একটা একটাকার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলাম, বললাম—"তোমার বকশিশ।"

আমার এইরকম দুষ্টুবুদ্ধি মাঝে মাঝে উদয় হয় মাথায়। একটু অর্থদণ্ড লাগে, কিন্তু মনটা একটু হাসির খোরাক পায়।…টাকা পেয়ে এরকম মুখ শুকিয়ে যেতে এর আগে দেখিনি আমি।

মনে করছ স্টেশনমাস্টারের ভয়ে? মোটেই নয়। একবার যেন চেষ্টা সত্ত্বেও ওর দৃষ্টিটা সামনে বহু দূরে গিয়ে পড়ল—যেখানে নাকি বাসটা এসে দাঁড়ায়, হয়তো চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তারপর নোটসুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে, ঝুঁকে একটা সেলাম করে মন্থর পদে চলে গেল।

—কী ভুলটাই হয়ে গেছে ঐরকম বোকামি করে মোট গছিয়ে দিয়ে পলটুকে। ঐ একটা টাকা অন্তত দুটোতো হতে পারতই মোট পৌছে বাসে তুলে দিলে।

পলটুকে প্রশ্ন করলাম—"কতটা হবে এখান থেকে—"বাস যেখানটায় দাঁড়ায়?"

পলটু জানাল—পোয়াটাক পথও হবে না, ঐ যে আমবাগানটা দেখা যাচ্ছে ওটা পেরিয়েই বড় সড়কের চৌমাথা, বাস এসে সেখানেই দাঁড়ায়।”

“ঠিক তো? ও তবে যে বললে ক্রোশ খানেকের বেশি?”

“যাওয়ার ভয়ে হুজুর। আপনি যতটা এসেছেন ততখানিও আর হবে না। ও বেজায় ধড়িবাজ, জানে আমার কোমরে ব্যথা, তবুও দেখুন না……”

“যেতে পারবি না তুই?”—ভীতভাবেই প্রশ্ন করলাম।

“সে কি কথা! জান লাগিয়ে দেব হুজুরের কাজে; কোমরে ব্যথা, সে তো তুচ্ছ। আমি তাহলে তাড়াতাড়ি একটু তেল মালিশ করে নিই হুজুর রমিয়াকে দিয়ে।

…গে রমিয়া!”—বলে একটা হাঁক দিয়ে বাঁ হাতে কোমরটা টিপে একটু ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ঘরের দিকে এগুল।

কিন্তু বেশ লক্ষ্য করেছি যখন বেরুল বাড়ি থেকে তখন মোটেই ন্যাংচাচ্ছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হলো না, শাঁসাল খদ্দের দেখে দর বাড়াচ্ছে। বললাম—“তাহলে না হয় থাক পলটু। আমি বরং এই লোকটাকে ডেকে নিচ্ছি, হাতের কাছেই যখন জুটে গেল। …এই শুনো!”

একটা চাষাভুষো গোছেরই লোক যাচ্ছিল, হাঁক দিলাম।

পলটু কোমর থেকে হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিযে একেবারে সোজা হয়ে ঘুরে চাইল, যদিচ একটু যেন চেষ্টা করেই। লোকটা আমার ডাকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আগে তাকেই নিরস্ত করল, বলল—“কুছো নই, তু যা যাঁহা যা তাড়-অ।”—অর্থাৎ কিছু নয়, যেথায় যাচ্ছিলি যা।

তারপর মুখে অল্প একটু হাসি নিয়েই এগিয়ে আসতে আসতে (শেষ রক্ষার জন্য বার দুই মাত্র নেংচে নিয়ে) বলল—“হুজুর

আপনি ডাগদর, না, উকিল, না দারোগা?"—ওরা বাঙালী মাত্রকেই এই ত্রিমূর্তিতে জানে কি না।

বললাম—"আমি ও তিনের একটাও নয়। কেন বলো তো?"

"ডাগদর হলে একটা ওষুধ দিতেন আমায়। অদ্ভুত রোগ তো। এই আছে, একেবারে পাশ ফিরতে দিচ্ছে না; পরের মুহূর্তেই একেবারে সাফ, কিচ্ছু নেই, যেন কার কোমরে ব্যথা হয়েছিল।...এই দেখুন না।"

আরও সোজা হয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

দেখছি ধূর্তের পীঠস্থানে এসে পড়েছি একেবারে। পয়েন্টস্-ম্যান, তারপর এই।

মনে মনে হেসে বললাম—"ডাক্তার না হলেও একটা মন্তর জানি যাতে এই রকম সব রোগ সঙ্গে সঙ্গে সেরে যায়। আর একটুও আছে বলে মনে হয়?

"রত্তিভরও নয়। এই দেখুন না।"

—হাত দুটো চিতিয়ে বার দুই ডাইনে বাঁয়ে কোমরটা দুলিয়ে আর একটু বড় করে হেসেই দাঁড়িয়ে রইল। আমিও আশ্চর্য হয়েই হাসলাম। মনে মনে বললাম, এবার কেসটা দারোগা বা উকিলের হাতে তুলে দিলে হত।

"তাহলে নিয়ে নিই এগুলো হুজুর? উঠবেন?"—

এগিয়ে যাচ্ছিল, বললাম—"একটু বসা যায় না? তোর এই জায়গাটায় কী যে আছে, লাগছে বড় ভালো। বাসটা কি এক্ষুনি আসবে?"

নিশ্চয় ভালো লাগবার মতো কি আছে আবিষ্কার করবার জন্যে একবার চারিদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর হাত চারেক তফাতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলল—"বাসেরও এখন দেরি আছে, এই খানিক আগে একটা বেরিয়ে গেল তো। হুজুর যাবেন কোথায়?"

"মজঃফরপুর।"

"দেরি আছে।" —ঘাস-জমিটুকু গামছা দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে ভালো করে চেপেই বসল পলটু, বলল—"এ জায়গা ভালো না লেগে তো উপায় নেই হুজুর। কী যে আছে এর মধ্যে আমরা তো বুঝব না, বুঝেছেন যিনি আমার পরদাদা। তাই তো এর মায়া এখনও ছাড়তে পারেন নি।"

"তোর পরদাদা, বেঁচে সে এখনও!"—বলে বিস্মিতভাবে চাইলাম। পলটুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। পরদাদা হচ্ছে বাপের ঠাকুর দাদা। টলস্টয়ের সেই গল্পটার কথা মনে করিয়ে দেয় যে—'এ গ্রেন অ্যাজ বিগ অ্যাজ এ হেন্‌স্‌ এগ পড়েছে?

—রাজার কাছে মুরগীর ডিমের মতো একটা বস্তু এনে হাজির করা হয়েছে, মাঝখানটাতে একটা খাঁজ, কেউ কিন্তু তার হদিস বাতলাতে পারছে না। যত বিজ্ঞ ও পণ্ডিতদের একত্র করা হলো, তারা পণ্ডিত এবং বিজ্ঞের মতো শুধু মাথা নাড়ল, অর্থাৎ জানে না, তবু এইটুকু জানাতে পারল যে এটা ক্ষেত্রজাত কোন শস্য ফল। শেষে বলল, কোনও অভিজ্ঞ প্রাচীন কৃষককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তো বোধ হয় বলতে পারে।

খুঁজেপেতে আনা হলো একজন এই রকম লোককে। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে, একেবারে পলিত-দন্ত, দু'-বগলে দুটো লাঠির (Crutches) ওপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল। দৃষ্টিশক্তিও একেবারেই গেছে, হাতে ফলটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আন্দাজ করে বলল—"না, মহারাজ, এরকম শস্য আমি ক্ষেতে আজ্জাইনি কখনও, হাটে-বাজারেও কিনিনি। আমি যা আজ্জেছি, কিনেছি তা এখনকার মতনই। আপনি আমার বাবাকে যদি ডেকে পাঠান তিনি হয়তো কিছু সন্ধান দিতে পারেন।"

তার বাবাকে ডেকে আনা হল।

একটা লাঠির ভারেই অনেকটা সোজা চালেই এল এ লোকটা। দৃষ্টি মোটামুটি ভালোই আছে, শুধু কানটার তত জুত নেই।

শস্যটা হাতে নিয়ে বেশ ভালভাবেই পরীক্ষা করে বলল—"না মহারাজ এ শস্য আমিও কখনও দেখিনি; ক্ষেতেও আজ্ঞাই নি। কেনার কথা বলতে গেলে—কেনার পাটই ছিলনা আমাদের সময়, সবাই নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন করে নিত। সে সময়ে আজকালকার চেয়ে বড় শস্য হত, তা থেকে আটাও বেশি পাওয়া যেত, কিন্তু এ ধরনের কিছু দেখিনি আমি। আপনি এক কাজ করুন আমার বাবাকে ডাকিয়ে আনুন, তিনি বোধ হয় এ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বলতে পারেন।"

ঠাকুরদাদা এল দিব্যি সিধা চালেই হাঁটতে হাঁটতে, লাঠির বালাই-ই নেই। পরিষ্কার সতেজ চাউনি, খাসা কান, পরিষ্কার উচ্চারণ। শক্ত সাজানো দাঁত দিয়ে শস্যটার একটুকরা কামড়ে নিয়ে বলল—"বাঃ, এ তো দেখছি আমাদের সময়েরই সেই গম।"

রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরদাদা জানাল—তাদের সময় নিজের বলে কোন জমি ছিল না, সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল পরম পিতা ভগবানের—তাঁর যে ছেলে যতখানি আবাদ করতে পারল ততখানি তার। বেচা-কেনা বলে কোন জিনিসই ছিলনা। প্রচুর মেহনত, পুষ্ট এবং প্রচুর খাদ্য, মানুষ নিজের আইনের বেড়া না তুলে ভগবানের আইন অনুযায়ীই জীবনযাপন করত, কাজেই ঠাকুরদাদা এত মজবুত এখনও। ক্রমে ক্রমে ওদিকে যেমন সব উল্টে গেছে, তেমনি এদিকেও দাঁড়িয়েছে অবস্থা—ঠাকুরদাদার চেয়ে বাপ বুড়ো, বাপের চেয়ে ছেলে।

পলটুর আবার ঠাকুরদাদার নয়, পরদাদা, আরও এক পুরুষ ওপরে। টলস্টয়ের গল্পের নীতি-সূত্র ধরে লোকটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে তো হওয়ার কথাও, আমি এই

পরিবেশের মধ্যে যেটুকু পেয়ে মুগ্ধ হলাম, যাত্রাপথে খানিকটা আটকে যেতে হলো, তার কত বেশি না পেয়েছে সে যার জন্যে চার পুরুষ ধরে জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারছে না; পাঁচ পুরুষই বলি, পলটুরও তো সন্তান আছে।

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"তোর পরদাদা! বেঁচে সে এখনও!"

"আমার বয়স দু' কুড়ি সাত সাল বাবু। আমার পরদাদার বয়েস তা হলে কত হতে পারে?······বেঁচে থাকবেন?"

বললাম—"তা কোন না এক শ সোয়া' শ' হবে?"

"এখন, বাঁচা দু রকম হয় বাবু। এই তো আমিও বেঁচে আছি। ঐ দুখানি ঘর, একটি মেয়ে, সাত সালের; একটি নেন্‌হা (ছেলে) পাঁচ সালও হয়নি। মেহরারু (বউ) আর আমি কড়িয়ে বাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করছি উদয়াস্ত, কোন রকমে একমুঠো যদি জোটে। এও তো একরকম বাঁচাই। তা আমার পরদাদা এমন কি পাপ করেছিলেন যে এ ধরনের বাঁচা বাঁচতে যাবেন এই সওয়া শ' বছর ধরে?"

আমি প্রশ্ন করলাম—"তাহলে?"

"ঐ বাড়িটা দেখুন বাবু, ঐ যে অনেক দূরে সাদা দো-মহল্লা বাড়ি।"

"সে ইয়ে, তিনি ঐ বাড়িতে থাকেন!"

—ভাষাটাকে তাড়াতাড়ি সম্ভ্রান্ত করে নিতে হল। উত্তরে, অনেক দূরে একটা টানা দোতলা বাড়ির ঊর্ধ্বাংশটা একটা আম বাগানের মাথার ওপরে রোদ ঝকঝক করছে; ঢেউ খেলানো কার্নীস, এক দিকে একটা উঁচু চিলে ঘর। সম্ভ্রান্ত বাড়ি; ওখানে রাজার হালে থাকে কেউ যদি এক শ সওয়া শ বছর পর্যন্ত মৃত্যুকে এড়িয়ে যায়, তো তেমন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই! কিন্তু···

অপেক্ষাই করছিল পলটু; মুখের দিকে চাইতে বললে—"ও বাড়িটা আমার পরদাদা না-মঞ্জুর করেছিলেন বাবু, অর্থাৎ নিতেই চাইলেন না। আমার পরদাদার নাম ছিল জীয়ন মুশহর।"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। প্রশ্ন করলাম—"নিতেই চাইলেন না? কার কাছ থেকে? কে দিতে চেয়েছিল তাঁকে?"

"তাহলে সবটাই শুনতে হয় আপনাকে।"

পলটু হাঁটু দুটো মুড়ে গামছার একটা পাকে বেঁধে নিয়ে গুছিয়ে বসল, এখানকার ঘরোয়া বা গাছতলার মজলিসে গল্প করবার বিশেষ পোজে (Pose)। এতে সুবিধে, হাত দুটো থাকে মুক্ত, গল্পের প্রয়োজন মত সঞ্চালিত করা যায়। বলল—"আজ থেকে প্রায় শ' খানেক বছরের কথা, আমার পরদাদার তখন জোয়ান বয়স। ভয়ানক ডানপিটে ছেলে--যেখানেই শক্ত কাজ, দুঃসাহসের কাজ, সেখানেই জীয়ন মুশহর। ফাঁদ পেতে বুনো শুয়োর ধরা হয়েছে, সলেশ বাবার সামনে বলি দেওয়া হবে—বুকে বাঁশের বর্শা বিঁধে, কেউ এগুতে সাহস করছে না, দেখ, জীয়ন মুশহর কোথায় আছে। এসে একাই তাক করে গিয়ে ধরলে দুটো দাঁত। অবশ্য সে-ও বুনো শুয়োরই, পড়ল বলি, ওরই একার হাতে, তবে বাঁ-হাতের কনুই থেকে নিয়ে একেবারে ওপর পর্যন্ত ফেড়ে দিয়ে গেল। বুড়ো বয়স পর্যন্ত—লাঙলের ফালের মতন সে-দাগ বয়ে বেড়িয়েছিলেন পরদাদা। জলায় কোথা থেকে কুমীর এসে পড়েছে একটা। নাকুটা (মেছো) কুমীর; জেলে নামতে দিচ্ছে না, মাছের বংশ সাবাড় করে দিচ্ছে, জমিদার-বাড়ি থেকে জীয়ন মুশহরের ডাক পড়ল। একটা পাশীদের (শিউলিদের) খেজুরগাছ-কাটা হাঁসুয়া আর একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে উঠল নৌকায়, তারপর মাঝ-জলায় কুমীরটাকে ভাসতে দেখে বাঁ উরুৎ দিয়ে গলা চেপে বসল। সামনের একটা পা হাঁসুয়া দিয়ে সাবড়ে দিয়েছে, ডাইনেরটা। তবে কুমীরও লড়েছিল বৈকি, বাঁ উরুতে তিনটে লম্বা নখের আঁচড় টেনে দিল। পরদাদার নাম পড়ে

গিয়েছিল—"ফাড়ল জীয়ন" অর্থাৎ চেরা-জীয়ন। তা ফাড়ুক, পরদাদা কিন্তু তার লম্বা চোয়াল দুটো দড়িতে বেঁধে নৌকোয় এসে উঠল। এসব হলো বড় বড় নমুনা, যা নাকি এখানে এখনও অনেকের মুখে শুনতে পাবেন। এ ছাড়া ছোট-বড় যে কত ছিল, তার কি হিসেব আছে?

এই গেল তাঁর ডানপিটেপনার ইতিহাস। গাঁয়ে দিন-দিনই বোলবোলাও বেড়ে যাচ্ছে, তারপর ঐ কুমীর ধরার ব্যাপার থেকে জমিদারের নজরে পড়ে গেলেন। তখন গদিতে রয়েছেন বর্ত্তমান বাবুর পরদাদা, বাবু হুকুম সিং। কুমীর ধরার বকশিশ হিসেবে পরদাদাকে চার বিঘে জমি লাখেরাজ লিখে দিলেন এইখানে। আগে আমাদের বাড়ি ছিল আজ যেখানে স্টেশন, তার পো'খানেক ওদিকে। বাপ মারা যেতে পরদাদা উঠে এসে এইখানে বাড়ি করলেন।"

পলটু ঘুরে একবার পেছন দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল—"অবশ্য এ-বাড়ি নয়। এ-চালাঘরের মটকাতে তো তাঁর মাথাই ঠেকে যেত। সে জমিও তো নেই, থাকলে তাঁর নাতি-নাতকুড়দের আজ এ-দশা? চার বিঘে থেকে এখন চার কাঠায় এসে ঠেকেছে। সে ফলনও নেই, তিনটে মাসেরও ফসল দেয় না বছরে।

যাক সে কথা, সবাই তো নিজের নিজের বরাতে খায়। কবীরজী বলেছেন—সমুদ্র সে তো অতল-অপারা আছেই, কিন্তু তুই তো ততটুকুই জল নিতে পারবি, যতটুকু তোর নিজের ঘটিতে আঁটে। থাক, পরদাদার গল্পটাই শুনুন আগে আপনি।"

গামছার বেড়ের মধ্যে আবার একটু নড়ে চড়ে বসল পলটু, তারপর আরম্ভ করল—"পরদাদার নসিবের ঘটিটা নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল বাবু; অনেকগুণই বড়, কিন্তু মনে হলো তাও বুঝি হঠাৎ ফেঁসে যায়…"

প্রশ্নের জন্যে মুখের দিকে চাইল পলটু। জিজ্ঞেস করলাম—"কি রকম?"

"জমিদারবাড়িতে খাতির বেড়েই চলল। জমানা তখন তো অন্য রকম—আইন আদালতের পরোয়া নেই, যিস্‌কা লাঠি উসকা ভৈঁসা। জমিদারদের মধ্যে যার যত শক্ত লাঠিয়াল, তার তত দখলদারি, তার তত প্রতাপ। রাজপুত রয়েছে, বাভন রয়েছে, গয়লা রয়েছে, সব একসে এক লাঠিয়াল, কিন্তু পরদাদার লাঠির সামনে সব লাঠিকেই মাথা হেঁট করতে হয়, খাতির দিন দিন বেড়েই চলল তাঁর। এদের সবার বুক জ্বলে, কিন্তু মনিবই যখন সহায়, তখন আর কার তোয়াক্কা? কিন্তু এমন ব্যাপার হয়ে গেল হঠাৎ একটা, সেই মনিবের একেবারে চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন পরদাদা।"

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি করে?"

পল্টু একবার দূরে বাসের রাস্তাটার দিকে চেয়ে নিল। বলল—"কাহিনীটা দীর্ঘ বাবু, খুঁটিয়ে বলতে গেলে সময় নেবে। ব্যাপারটা স্ত্রীলোকঘটিত। বাবু হুকুম সিং এদিকে ভালো লোক হলেও সব জমিদারের যা রোগ ছিল, তা থেকে তো আর বাদ যেতে পারেন না। অন্য জমিদারি থেকে একটি বিধবা মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—লুটে আনাই, পরদাদা রাতারাতি তাকে উদ্ধার করে—অবিশ্যি চুরি করেই—বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। একেবারে রাজরোষ তো, গিয়ে পড়ল ঘাড়ে, শির নিয়ে আসবারই হুকুম হলো বাবু হুকুম সিংয়ের। পরদাদা গা ঢাকা দিতে শিরটা বেঁচে গেল, তবে আক্রোশটা অন্য দিক দিয়ে পড়লই এসে। ফসল কাটার সময়, সমস্ত ফসল কাটিয়ে লুটিয়ে দেওয়া হলো, তারপর একদিন..."

আমি প্রশ্ন করলাম—"জমিটা কেড়ে নিলেন না?"

পল্টু একটু জিভ কাটল, বলল—"তা কি করে নেবেন, দান-করা জিনিস, অধর্ম তো করতে পারেন না। তবে হুকুম হয়ে গেল, ও-ক্ষেতের ফসল আর জীয়ন মুশহরের ঘরে উঠবে না, পুস্ত-র-পুস্ত (পুরুষানুক্রমে)। ...হুজুর হাসলেন যে?"

হাসলাম—আমার সেই পরম বৈষ্ণব গৃহস্থের কথা মনে পড়ে গেল। বাড়িতে চোর ঢুকে ধরা পড়ে গেছে, টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক প্রহার দিচ্ছে সবাই, কর্তা জপে ছিলেন, উঠে এসে দয়াপরবশ হয়ে প্রশ্ন করলেন—"ব্যাপারখানা কি রে?"

"আজ্ঞে, চুরি করছিল ব্যাটা।"

"তা বলে এত প্রহার, কৃষ্ণের জীব মরে যাবে যে!"

"কি করা যায় তাহলে আজ্ঞা করুন।"

"থলেয় পুরে কুয়োয় ফেলে দাও। আহা, কৃষ্ণের জীব!"

পুরুষানুক্রমে হা-হুতাশের সঙ্গে দেখবে ক্ষেতের পাকা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে; তার চেয়ে একেবারে কেড়ে নেওয়াটা কম সাজা হলো বৈকি। পলটুকে বললাম—"না' এমনি হাসাছ। তাহলে তোরও তো এই চার কাঠার ফসল পাওয়ার কথা নয়—"

"ও-হুকুমটা তো আর রইল না হুজুর। বাবু হুকুম সিং মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ববুয়াসীন সাহেবা (জমিদারপত্নী) ওঁর ওটা রদ করে দিলেন…"

"তার কারণ? বনিবনাও ছিল না স্বামী-স্ত্রীতে?"—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

পলটু বলল—"এমনি তো খুব ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রীলোক ছিলেন। কিন্তু স্বামীর স্বভাব তো ঐ, বনে কি করে বলুন না। পরদাদার কাজটায় খুশীই তো হয়েছিলেন, সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে বকশিশ করেন। শ্রাদ্ধ হয়ে যেতে বাবু হুকুম সিং নাবালক ছেলের হাতে পিণ্ডিটা খেয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়াসীন সাহেবাও নায়েবকে ডেকে বলে দিলেন—ধান কেটে জীয়ন মুশহরের ঘরে দিয়ে আসা হোক। ফসলেরই সময়, বোঝায় বোঝায় সব ধান এসে পৌছুতে লাগল।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। সত্ত-সত্ত যে অত্যাচারের ঝড়টা

ঘরে গেল সেটা তো এখনও গল্প হয়ে রয়েছে এখানে। অবস্থাটা ফেরার পর পরদাদা বাড়িটাও একটু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি, তেমন কিছু নয় তখনকার দিনে আমাদের মতন লোক—গরীবগুর্বা, দুসাধ-মুশহরেরা তো ইচ্ছে মতন বাড়ি করতেও পারত না—বাভন রাজপুতদের অপমানই তো সেটা—খানচারেক চালা ঘরই তুলে নিয়েছিলেন পরদাদা—মাটির দেয়াল, বাঁশের টাট্টি দিয়ে উঠানটা ঘেরা—একদিন বাবু হুকুম সিংয়ের মাহুত হাতি নিয়ে এসে সমস্তটা ভেঙে উপড়ে তছনছ করে দিয়ে বাঁশ, খড়, চৌকি, সিন্দুক—যা ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

বছর খানেক পরের কথা।

একটা কঠিন পীড়া হয়ে গুজব রটে গিয়েছিল যে বাবু হুকুম সিং মারা গেছেন। পরদাদা ঐ ব্যাপারটার পর তীর্থে তার্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে, বোধ হয় ঐ খবরটা শুনে একদিন গভীর রাত্রে ফিরে এলেন গ্রামে।

এই যে আপনি কদম গাছটার নীচে বসে আছেন, এটা তখন সবে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে একটু। পরদাদার হাতের পোঁতা গাছ, আর শোনা যায় বাবু হুকুম সিংয়ের মাহুত এসে যখন হাতি দিয়ে বাড়িটা ভেঙেচুরে দেয়, গাছপালা সব নষ্ট করে দেয়, হাজার চেষ্টা করেও সেটাকে এই গাছটার দিকে নিয়ে আসতে পারেনি। পরে অমন যে অগ্নিকাণ্ড হল, তাতেও নাকি এর একটি পাতা ঝলসায়নি। সত্যি মিথ্যে হনুমানজী জানেন, তবে এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর সব কদম গাছে শ্রাবণ গেল তো ফুল শেষ, এতে আশ্বিনেও রয়েছে ফুটে। দোফলা গাছ, কোজাগরী লছমী মাঈয়ের পুজো তো, এইবার যাবে। আসল কথা কি জানেন? কবীরজী বলেছেন—

মন্‌মা (মন) তুই বড় বড় মন্ত্র পড়ে পণ্ডিতাই করিস—কিন্তু দু' অক্ষরের রাম নামের সামনে তাদের এনে একবার পরখ করে দেখতো তারা কত ছোট। ঐ সব এমারত সেই বড় বড় মন্ত্র

হুজুর—পরদাদার পোঁতা এই কদমগাছের সামনে দাঁড়াতে পারে? ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

ঘরদোর বলতে আর কিছুই নেই, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক—নিজের হাতে পোঁতা এই একটি গাছ, পরদাদা এইটির নীচে বসে দুনিয়ার অসারতা সম্বন্ধেই নিশ্চয় চিন্তা করছিলেন,—এইরকম কোজাগরী লছমী পুজোর রাত্রির, চারিদিক নিস্তব্ধ, হঠাৎ কানে গেল—"কৌন রে বেটা, অকেলা ইঁহা ক্যা করতা?"

আওয়াজ শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখেন একজন সন্ন্যাসী পেছনে দাঁড়িয়ে। মাথায় প্রায় কদমগাছটার মতন, তবে বেশবাসে নানকপন্থী, কি রামানুজী, কি অঘোরী, কি গৌরপন্থী কিছু বোঝবার জো নেই। যাই হোক পরদাদা একটু তফাত থেকেই গড় করে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন—"একলাই করে দিয়েছেন ভগবান আমায় বাবা। এইখানে আমার বাড়ি ছিল—চারখানা ঘর, দুয়ার ..."

আর বলতে পারলেন না। বেশ উদাসীনের মতন চুপ করে বসেই ছিলেন, ঝরঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ল। জাতে অস্পৃশ্য মুশহর বলেই পরদাদা পা ছুঁয়ে প্রণাম করেননি। সন্ন্যাসী কিন্তু বেশ চেপে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন—"ঘরদুয়োরের জন্যে তোর দুঃখ আছে মনে?"

পরদাদা বললেন—"পরিবার আত্মীয়স্বজন জমিদারের ভয়ে কে কোথায় জানি না; আছে কি নেই তাও জানি না, সুতরাং ঘরদোরে আর আমার কি কাজ? আমার দুঃখ শুধু এইজন্যে যে আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন আমার ভিটেয়, আমি আজ এমনই ফকির যে গাছতলা ভিন্ন আর বসাবার জায়গা নেই।"

আরও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন পরদাদা। তখন ভরা জোয়ান, তিন কুড়িও বয়েস হয়নি, সন্ন্যাসী তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"চুপ কর, তুই এই গাছতলার মাহাত্ম্য জানিস না বলেই অমন কথা বলছিস। তোর এখানে এমারত থাকলেও কি আমি

এ-গাছতলা ছেড়ে সেখানে গিয়ে উঠতাম ভেবেছিস? যাই হোক, তোর এমন হল কেন, আমায় খুলে বল। দেখি যদি কিছু করতে পারি তোর জন্যে।"

পরদাদা সে-রাত্রের গল্পটা বলতে খুব ভালবাসতেন, জীবনের ধারাই বদলে গেলো তো। বলতেন—ভাবলাম সন্ন্যাসী মানুষ, তিনি তো সবই জানেন, তবু আমায় রহস্য করে জিজ্ঞেস করা কেন? তীর্থে তীর্থে ঘুরে কিছু হুঁশ হয়েছিল, বুঝতে পারলাম—যা করলাম তাতে নিজের দম্ভ প্রকাশ পায় কিনা সেইটে নিশ্চয় জেনে নিতে চান।—দম্ভ কোনকালে ছিল না পরদাদার—শক্ত কাজ, করিয়ে নিতে চাও?—হাজির আছি। অন্যায় হচ্ছে কোথাও? প্রাণ দিয়ে প্রতিকার করতে হবে?—হাজির আছি।—এই ছিল তাঁর মনের ভাব। তবুও যাতে একটুও ঘমণ্ড্ প্রকাশ না পায় সেই দিকে আরও হুঁশিয়ার হয়ে সমস্ত কাহিনীটা বলে গেলেন। শুনে সন্ন্যাসী একটু হেসে ঠাট্টা করে বললেন—"সেই কবে তুই মেহনত করলি, আজ ক্ষিদে পেয়ে গেল আমার, কিছু আছে?"

পরদাদার চোখে আবার জল ভরে এল। হাতজোড করে বললেন—"প্রভু, গোলামের সঙ্গে এ কী রহস্য করছেন? থাকবার যা তা তো দেখতেই পাচ্ছেন সামনে। আজ এক সন ধরে একরকম বলতে গেলে ভিক্ষেই সম্বল; আমি আপনাকে কি দিতে পারি?"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন—"তোর গামছায় কি বাঁধা রয়েছে দেখছি। দিতে চাস না?'

পরদাদা বললেন—"পথে আসতে এক গাড়োয়ান কিছু নতুন ধানের চিঁড়ে দিয়েছিল, তার গাড়ির চাকা পাঁকে পুঁতে গিয়েছিল, তুলে দিই। কিছু খেয়েছি, কিছু পড়ে আছে।"

"তা বেশ তো, বাকিটুকু দে আমায়"—বলে হাত বাড়াতে পরদাদা অপ্রস্তুত হয়ে পুঁটুলিটা পাশে সরিয়ে নিয়ে বললেন—"আমি একে জাতে মুশহর, অস্পৃশ্য, তার ওপর এটা এঁটো-করা, আপনার সেবায়

কি করে দিতে পারি দেবতা? একে তো পূর্ব-জন্মে কত যে পাপ করেছি…"

সন্ন্যাসী শেষ করতেও দিলেন না, কতকটা যেন রাগ করেই 'কিরপিন, বদমাস' এই গোছের কয়েকটা গালাগাল দিয়ে কেড়ে নিলেন গামছাটা। তারপর কয়েক গ্রাসে চিঁড়ে কটা শেষ করে দিলেন। পরদাদা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন, শেষ হতে পাড়ার কাউকে ডেকে জলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন, উনি বাধা দিলেন, বললেন—"অমৃতকুণ্ড ছেড়ে আর কোথাকার জল খাব এখানে আমি?"

পরদাদা একটা পুকুর কাটাতে কাটাতে জমিদারের অত্যাচারে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—শুকুতে শুকুতে এখন ঐ হাত কয়েকের ডোবাটুকুতে দাঁড়িয়েছে। ভরা বর্ষাতেও কোমর-জল হয় না, অনেকদিনের কথা তো। সন্ন্যাসী এগিয়ে গিয়ে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে উঠে এলেন, যেন কী ভুরি-ভোজই না সারা হোল, বললেন—"তুই কি চাস এবার মেগে নে আমার কাছে, এবার যাব।"

আগে হলে বোধ হয় চাইতেন কিছু, কিন্তু এক সন ধরে শুধু তীর্থে তীর্থে ঘুরে পরদাদার মেজাজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল বললেন— "কি চাইব প্রভু? দুনিয়ার জিনিসের অসারতা এই তো দেখতেই পাচ্ছি, আজ আছে কাল নেই।"

"দুশমনের মৃত্যু?—যে তোর এই দুর্দশা করলে।"

পরদাদা বললেন—"সে তো ভালোও করেছিল একদিন, আসল কথা শত্রুমিত্র তো বোঝাও শক্ত, কার মরণের হেতু হয়ে পাপের ভাগী হই?"

সন্ন্যাসী বললেন—"থাক মৃত্যু তাহলে। তুই এমারত নেই বলে দুঃখ করছিলি। তোকে আমি ঐ এমারতের মালিক করে দিচ্ছি; সে ক্ষমতা আমার কাছে আছে। বল্ চাস্ তো।"

কথা কইতে কইতে পরদাদারও তখন সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা

কেটে গেছে, বললেন—"কি হবে একজনকে বঞ্চিত করে প্রভু? ক'দিনেরই বা জিন্দগি?"

"তাহলে একটা আলাদাই কিছু দি তোকে ওর চেয়েও বড়। জায়গা ঠিক কর তুই। ভোজবাজি ভাবিস নি, এক বছরের মধ্যেই এমন সব ব্যাপার হবে, বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে তোর বাড়িও তোয়ের হয়ে যাবে।"

পুরুষানুক্রমে আমাদের দুর্দশার জন্যে পরদাদার দুর্মতি বলব, কি বিষয়সম্পত্তির অসারতার জন্য সুমতিই বলব জানি না, এবারেও তিনি যা উত্তর দিলেন তা ঠিক আগের মতনই, বললেন—"গোস্তাকি যদি মার্জনা করেন তো বলি প্রভু, এই তো একটু আগে আপনিই বললেন এমারতের চেয়ে গাছতলা ভালো, তাহলে আমায় সেই এমারতের জন্য লালচি করে তুলেছেন কেন?"

কথাটা যোগী মহারাজের নিশ্চয় খুব ভালো লেগে থাকবে, তিনি ওঁর ডান কাঁধটা চেপে ধরে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—"তোর মুখে যে অন্য উত্তর থাকতে পারে না এটা জানতাম আমি। তুই নিজেকে চিনিস না, আমি একবার পরখ করে নিচ্ছিলাম। মা জানকীর সময় থেকে যুগে যুগে পৃথিবীর কত জায়গায় নারীর অপমান হয়ে আসছে তাই মহাবীর হনুমানজীও তার শক্তি স্থানে স্থানে ছড়িয়ে রেখেছেন। তুইও সেই শক্তিতেই শক্তিমান, নয়তো সাধ্যি কি ঐ রকম প্রবল জমিদার—পিশাচের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসিস সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণকন্যাকে? সেই শক্তিরই অংশ, তুই তো চাইবি না, কোনরকম বিষয়সম্পত্তি, কোনরকম যশ-প্রতিষ্ঠা। তোর প্রাপ্য অন্য জিনিস আমি তোকে তাই দিয়ে যাচ্ছি।"

পরদাদার মাথায় হাত চেপে বললেন—"তুই তাঁরই মতন অমর হয়ে থাক।"

শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় খুশী হয়ে উঠে থাকবেন পরদাদা, কিন্তু একটু ভেবে দেখতেই সে ভাবটা চলে গেল, বললেন—"কিন্তু

এই পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা, প্রভু, নিজের চিরবার্ধক্য, শক্তি নেই —না হয় চির-যৌবনই রইল—নিজের চোখের সামনে যারা আপন তাদের মৌৎ হয়ে যাচ্ছে, নিরুপায় ভাবে দেখছি—এ চিরকাল বেঁচে থাকায় লাভ ?"

যোগীরাজ বললেন, "মহাবীর হনুমানজী যে বেঁচে আছেন, অমর হয়ে। কেউ তাঁকে দেখেছে ?"

পরদাদা বললেন—"কই এমন তো শুনিনি।"

যোগীরাজ বললেন—"তুমিও সেইরকম ভাবেই থাকবে বেঁচে। তুমি সবই দেখবে, সবই করবে, কিন্তু তোমায় কেউ দেখতে পাবে না।...আমার পরদাদাও সেইরকম ভাবে বেঁচে আছেন বাবু, আজ পর্যন্ত।"

পল্‌টুর গল্প সেই চিরন্তন মানবিক পরিণতিতে এসে থেমে গেল। মানুষের সেই পুরাতন বিশ্বাস মরজগতের একমাত্র সান্ত্বনা, যারা গেল মৃত্যুর পরও তারা সবাই আছে বেঁচে ; যারা রইল পড়ে, স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে তাদের দিকে আছে চেয়ে। পল্টুর পরদাদা জীয়ন মুশহর ছিল বংশের কৃতী পুরুষ, তাকে তাই বিশিষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছে পল্টু। তাই তো করে সবাই।

গোড়ায় যে ইণ্টারেস্ট বা কৌতূহল জাগিয়েছিল, সেটা গেছে মরে। তবু চুপ করে বসে না থেকে প্রশ্ন করলাম—"তা বেঁচে যে আছেন, কোথায় আছেন তিনি ?"

নিতান্তই একটা উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন, যদিই বা থাকে কিছু উদ্দেশ্য তো সে শুধু গল্পটার জের টেনে রাখা। কিন্তু এইতেই আর একটা নতুন ইণ্টারেস্ট নিয়ে নূতন দিকে এগুল গল্পটা। পল্টু উত্তর করল— "এইখানেই আছেন তিনি বাবু। ভিটে ছেড়ে আর কোথায় থাকবেন ? তিনি আছেন বলে তো আমরাও পুরুষানুক্রমে এই চালা দুটো আশ্রয় ক'রে পড়ে আছি। তপস্যা করছেন তিনি, কবে তাঁর তপস্যা শেষ হবে, দয়া ক'রে আসবেন

কিষুণ মহারাজ, তা তো কেউ জানে না। তাঁকে মানুষ করে তুলতে হবে, নইলে দেখছেনই তো—'অব্বল' শরীর নয় তো বাবু, জীয়ন মুশহরেরই সন্তান তো আমরা—সব্বাই যারা পুরুষ, মুলুকে (বাংলা-দেশে) গিয়ে কামিয়ে নিয়ে এসে ঘরবাড়ি তুলছে, জমি কিনছে, আমরাই কি পারি না? কিন্তু ঐ কথা, এ ভিটে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই আমার। ঐ যে বড়াবাবু, 'টীশন মাস্টার', উনি কি ওঁর টীশন ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন? ঐ যে জিলার মালিক মাজিস্টর সাহেব, উনি কি মঝঃফরপুর ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন?"

বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পলটু। দারিদ্র্যের মধ্যে বংশের ধারা বেয়ে একটা মর্যাদা, অন্য সবার চেয়ে আলাদা ধরনের একটা কৌলীন্যবোধ যে রয়েছে ধমনীর মধ্যে সেটা হঠাৎ উঠেছে জেগে। আর কিছু না হোক, গল্পটা এগিয়েও তো যাক খানিকটা। আমি প্রশ্ন করলাম—"তিনি তপস্যা করছেন বললে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এইখানে বসেই—কিষুণ মহারাজের জন্যে।"

"কিন্তু কেউ যদি কখনও নাই দেখে থাকে..."

"দেখবে যে, তার জন্যে পুণ্যিবল থাকা চাই তো। হনুমানজীও তো মা-জানকীর দোয়ায় চিরজীবী হয়ে বেঁচে আছেন, কিন্তু আপনি-আমি কি দেখতে পাচ্ছি? তবু পরদাদাকে আমরা মাঝে মাঝে দেখি বৈকি।"

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"না, সে যা দেখি, সেটা এমন কিছু পুণ্যির জোরে নয়। তেমন পুণ্যই যদি থাকবে আমাদের তো স্বামীস্ত্রীতে উদয়াস্ত খেটে মরছি তবু এ-দশা ঘোচে না কেন? কথাটা হচ্ছে, যত পাপীই হই তবু তাঁরই তো সন্তান আমরা, মাঝে মাঝে দেখা দিতেই হয়। বরং পাপী বলেই দেখা দিতে হয় তাঁকে, নইলে, তাঁর দর্শনে যদি পাপক্ষয় না হয়ে যায় তো, যখন এই পাপের দেহটাকে লাথি মেরে চলে যাব তখন তাঁর কাছে পৌঁছাব কি করে? কথাটা হচ্ছে, সন্তানের পাপ কেউ ধরে না, ধরলে চলে না। কিষুণজী

দই-ক্ষীর-ননী চুরি করে নাজেহাল ক'রে দিতেন যশোদা-মাইকে, একটা কথা বলতেন কখনও? বাইরের কেউ ওর সিকি ভাগও উপদ্রব করলে করতেন বরদাস্ত?—আপনিই বলুন না?"

"প্রায়ই দেখতে পাও তা হলে?"—কৌতূহলটা আবার কমে গিয়ে নিতান্তই অলস একটা প্রশ্ন—না হয় চলুক না পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্পই একটা। পলটু একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর করল—"প্রায়ই কি বলছেন বাবু? পরদাদার এই প্রায় এক শ' বছরের তপস্যা—যোগী মহারাজ বলেছিলেন এক শ' বছর পূর্ণ হলেই তাঁর 'মন্‌শা' পূর্ণ হবে—আসবেন বিষুণ মহারাজ, তিনিও বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন। তা এক শ' বছর তো হয়েও এল। হয়তো পূর্ণও হয়ে গেছে, পাঁজি দেখে তো রাখেনি কেউ—তা এলেন কই তিনি? যাক, সে তো আমাদের নসিবের কথা আপনি যে প্রায়ই দেখবার কথা বলছিলেন—এ জিনিস কি এবেলা-ওবেলা দেখা যায়? আমার ঠাকুরদাদা নাকি দেখেছিলেন তিনবার। বাবা দেখেন বার দুই। আমি আজ পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখেছি, পুণ্যের ধারা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে তো।"

"কি দেখলে?"—এবারও সেই রকম কৌতূহলহীন প্রশ্নই, মনটা বারবারই রাস্তায় গিয়ে পড়ছে, কখন বাসটা এসে পড়বে। হাতঘড়িটাও উল্টে দেখে নিলাম।

"সেদিনও এই রকম পরিষ্কার আকাশ হুজুর, তবে এ যেমন দিনদুপুর, আগেই বলেছি সেটা ছিল রাত্তির—পূর্ণিমা রাত্তির—কোজাগরী লছমী পুজোর..."

"চুপ করো!!—থামো তো পলটু!!—ও কে!!—এরকম একটা থ্রিল (thrill)—বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময়-শিহরণ, জীবনে আর কখনও অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না আমার। চোখের তারা দুটো একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়ে মুখের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পলটুও যেন একেবারে বিমূঢ়

হয়ে গেছে। একটু নির্বাক হয়ে গিয়ে বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করল—"কি বড়াবাবু?...আপনিও দেখতে পেলেন নাকি?"

"হ্যাঁ...বোধ হয়..."

এর পরই সংবিৎটা কিছু কিছু ফিরে এল, যদিও অনুভব করছি তখনও মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে রয়েছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সহজ করে এনে প্রশ্ন করলাম—"ও ছেলেটি কে?"

মসীকৃষ্ণ একটি প্রায় বছর ছয়েকের শিশু, সুডৌল, একেবারে নগ্ন দেহ, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা, মাথায় এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ডগাগুলো তেলের অভাবে পিঙ্গল। কোমরে একটা হলদে নতুন ঘুনসি, গলায় টকটকে রাঙা কৃত্রিম মুগার মালা—এ দেশের প্রায় সব ছেলের গলায়ই যা থাকে। ছুটো কদম ফুল সুদ্ধ একটা কদম গাছের ডাল, বাঁ হাতে বুকের ওপর চেপে ধরা। ডোবাটার ধারে নেমে হ্যালা ফুল তুলছে; একটা তুলে একটার ডাঁটায় হাত দিয়েছে।

ওপরে জল থেকে হাত খানেক তফাতেই একটি বছর চারেকের মেয়ে। অতো কালো নয়। যে রকম উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হলো হ্যালা ফুলের ফরমাশটা যেন তারই।

পলটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে আছে। ঐ দিকেই, কিন্তু ও-ছেলের দিকে নয়। যেন খুঁজছে কোন্ ছেলেকে দেখে আমার এই উৎসুক প্রশ্ন, এই নিশ্চল ভাব। প্রশ্ন করল—"কোন্ ছেলে বড়াবাবু?"

আরও কতকটা সামলে নিয়েছি, বললাম—"ঐ যে হ্যালা ফুল তুলছে।"

"ও-টা আমার বেটা রামকিষনা। ভয়ানক দামাল বাবু। বুড়ো বয়সে ঐ একটা ছেলে, সলেশবাবাকে অনেক বলি চড়িয়ে, কিন্তু ওর আশা নেই বাবু—এক নম্বর শয়তান, কোন দিন জলে ডুববে, কি সাপে কামড়াবে তার ঠিক নেই। আর মিট্ঠু মুশরের মেয়ে

ঐ ছুকরিয়াটা—ঐ বয়সে অমন বেয়াড়া মেয়ে···অরে রামকিষনা, উঠ্, না তো উঠতানি হাম।"

উঠল পলটু। যেতে যেতে মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"মাতুলি আর ফকিরের তাবিজ দিয়ে এ ছেলে বাঁচানো যাবে বাবু? আপনি ছিলেন তাই তো নইলে আজ···"

ছেলেটা উঠে এসে মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত পাঁক। নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে পলটু বলল—"লে, বড়াবাবুকে পরনাম কর্।"

অপ্রতিভভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় গায়ের ঝাল মিটিয়ে চড় মারতে যাচ্ছিল পলটু হাত তুলে—আমি এদিকে চোখ দুটো কোথায় রাখব ঠিক করতে পারছি না, ও চড় উঁচুতেই যেই মুখ তুলে চেয়েছি একেবারে থ হয়ে গিয়ে বিস্মিত প্রশ্ন করল—"ও কি বড়াবাবু, আপনার চোখে জল!"

"তুই মারিসনি তা বলে ঐ ননীর ছেলেকে। জল কই চোখে—ওরকম হয় আমার সূর্যের দিকে চোখ থাকলে বেশিক্ষণ।"

কোঁচার খুঁট দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে গিয়ে আরও যেন ডেকে আসে বান। কী যেন হয়ে গেছে, একদিকে বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছা, একদিকে অতি ভাবালুতার লজ্জা। মান বাঁচাল বাসের হর্নটা, অনেক দূরে লম্বা এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ, মনটা চকিতে ঐদিকে ঘুরে গেল, বললাম—"নে, তোল মোটটা, এসে গেল ঐ।"

"ও লরি বড়াবাবু, বাসের দেরি আছে।"

"তা হোক, তুই তোল। স্ট্যাণ্ডে গিয়েই বসা যাক।"

"পরনাম না করলে তু? মারলাগেকে?"

—ছেলেটার দিকে ঘুরে বলতে সে একটু ঝুঁকে পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম হাতটা, মনে

হলো এখনি কত বড় যেন একটা অপরাধ হয়ে যেত। পকেট থেকে একটা টাকা বের ক'রে মুঠার মধ্যে দিয়ে মুঠাটা মুড়ে দিয়ে বললাম—"হোলা পরনাম, লে দহি-মক্‌খন খেইহে।"

চাপবার চেষ্টা তো করছি ভাবালুতা, কিন্তু কথাগুলো যেন বেরিয়ে যাচ্ছে ঐ সুরে।

"বড়াবাবু রুপেয়া দেলে বাড়ন, তু ফুল না দেব—বউয়া হমর ?" উপার্জন করেছে ছেলে, চকচকে গোটা টাকা একটা, কণ্ঠস্বর দ্রব হয়ে গেছে পলটুর। রামকিষনা তিনটে ফুলই বাড়িয়ে ধরল।

এত লুব্ধ কখনও হইনি জীবনে, তার কারণ মনের সেই তরল-ভাবটা এখনও তো সামলাতে পারিনি। মনে হচ্ছে এ যেন কত তপস্যার ধন, কার হাত থেকে কী বস্তুই না নিচ্ছি। দ্বিধাও রয়েছে বৈকি, শিশুর সঞ্চিত ধন। সেই দ্বিধার মধ্যে হঠাৎ কেন জানি না দৃষ্টিটা ডোবার ধারে গিয়ে পড়ল। মেয়েটা আমার চেয়েও লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল—লুব্ধ আর শঙ্কিত; চোখাচোখি হতেই মুখটা ওদিকে ঘুরিয়ে নিল।

দ্বিধা কেটে গেল আমার। আজ একটার পর একটা অপরাধ থেকে আমায় কে বাঁচিয়ে যাচ্ছে এমন ক'রে ?...ডাক দিলাম, "দুলারিয়া, আ তো।" কেন যে প্রথম ডাকেই গুটিগুটি এসে দাঁড়াল, বলতে পারি না, কোন্ জন্মের অনেক সংকোচ কাটানো অভ্যাস আছে বলেই কি ?...রামকিষনাকে বললাম—"দুলারিয়াকে দে।"

কদম দেয় কি হ্যালা দেয়, দেখাই যাক না।...দুটোই দিয়ে দিল। এও হয় তো কোন জন্মের সব-উজাড় ক'রে দেওয়ারই অভ্যাস।

অপরাধের ওপর অপরাধ হয়ে যায় যে। রামকিষনা পাবে টাকা আর দুলারিয়াই নয়! পকেটে হাত দিতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে দুটো টাকার ওপরই হাত ঠেকল। দ্বিধা না করে দুটোই বের করে দিয়ে দিলাম ওর হাতে।

অস্বীকার করবনা, কেমন যেন একটু সাধ হলো—বেশ তো, না হয় এই বিয়েই সেই আর এক কোন্ জন্মের মতো ঝগড়া-মান-অভিমান হবে'খন একটু।…শুধু, আমিই পাব না দেখতে।

উঠে পড়লাম পথে।

নিঃশব্দে চলেছি দুজনে। মনটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছে—এক যুগ থেকে আর এক যুগের মাঝখানে একটা স্বর্ণ সেতু—কথা কইতে সাহস হচ্ছে না—কিছু বলতে গেলেই আবার যদি চোখে জল এসে পড়ে। এবার তো সূর্যের উল্টো দিকে মুখটা ঘোরানো।

অনেকটা এসে কি মনে হতে একবার ঘুরে চাইলাম। দুলারিয়ার মন ভরেনি, ছেলেটা আবার কখন্ জলে নেমেছিল, দেখি আর একটা ফুল হাতে ক'রে কদমতলাটায় দুজনে সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যিই কি জীবন মুশহরের তপস্যা হলো পূর্ণ।

পথ চলতে চলতে অবশ্য ও-ভাবটা কেটে এল। আমার ভেতরের লেখক মানুষটি গল্পটা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। কোন শক্তিমান পূর্বপুরুষের শক্তির সঙ্গে, সমৃদ্ধ-সম্ভাবনার সঙ্গে, পরবর্তীদের দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যর্থতা মিলিয়ে একটা গল্প দাঁড় করিয়েছে। পলটুর হয়তো পারিবারিক কাহিনীই একটা, পুরুষানুক্রমেই আসছে চলে। রক্তের তেজের সঙ্গে অসামর্থ্যের ক্ষোভ রয়েছে মিশে; যে হর্ম্য স্বপ্নেরও বাইরে, জীর্ণ কুটির তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিতান্ত ঈর্ষাবশেই তাকে তুচ্ছ, অকিঞ্চন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। নিত্য এই তো হচ্ছে পৃথিবীতে। এই সান্ত্বনা বুকে করেই তো দারিদ্র্য আছে বেঁচে।

লরি, তাও চুনের লরি। একটা চায়ের দোকানের সামনে

বোঝা নামিয়ে পলটু আমায় একটা মুলো চেয়ার এনে দিয়েছে, বসে আছি, এমন সময় আর এক দুঃসংবাদ।

দোকানী প্রশ্ন করল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমার আগে পলটু জবাব দিল—"মঝঃফরপুর। ফাস্ট কিলাসকে জগহ মিলি বাসমে?"

বাজে প্রশ্ন। কোথায় বাস, তার ফাস্ট ক্লাসে জায়গা আছে কিনা এখান থেকে কি করে জানবে লোকে? কিন্তু তা তো নয়, পলটু খদ্দের-গৌরবে গর্বিত, একটা গালভরা কথা না বলে বাঁচে কি করে?"

"বাস তো রাস্তামে বিগড় গৈল বা।"—তখনও ডোবার ধারটা অন্যমনস্ক করে রেখেছে কিছু কিছু। দোকানীর কথায় আমি চকিত হয়ে ঘুরে চাইলাম তার দিকে। আবার আমাকেই বলল—জা হাঁ হুজুর, এ লরি ড্রাইভারকে জিগ্যেস করুন না।

ড্রাইভার আর লরির জন তিনেক লোক বেঞ্চে বসে চা পান করছিল, জানালো প্রায় মাইল চারেক দূরে তারা দেখে এসেছে বাসটাকে, ড্রাইভার কনডাকটার মিলে বনেট তুলে কি সব কলকব্জা মেরামত করতে ব্যস্ত।

"দেরি হবে?"—প্রশ্ন করলাম।

ওরা কিছু বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানাল যে প্রায় মাইলখানেক যখন এগিয়ে এসেছে, ছাখে যাত্রীরা নেমে ঠেলছে কিন্তু নড়াতে পারছে বলে মনে হলো না। যেটুকু পেয়ালায় ছিল এক চুমুকে শেষ করে দোকানীকে বলল—"অওর এক কাপ ভইয়া।"

বাসে-লরিতে চিরকাল আড়াআড়ি, এমন দরাজ গলায় পেয়ালাটা বাড়িয়ে ফরমাশ করল, মনে হলো এই বাড়তি মৌজটুকু লরির আজকের এই বিজয়োৎসবেই।

"তা হলে উপায়?"—পলটু.কই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, তাও ইশারাতেই, দোকানীর দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়েই বললাম—

"তা হলে উপায়? আমায় যে পৌঁছাতেই হবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে? পাটনার ট্রেন ধরতে হবে।"

বলল—"রিকশা রয়েছে ঐ যে।"

খানিক দূরে খানচারেক দাঁড়িয়ে ছিল, রুগ্ন গোছের, বললাম—"ন' মাইল পথ!...আমায় এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট করে দিতে পার তাড়াতাড়ি?"

এতক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ ফরমাশটা করা এমন বেখাপ্পা হয়ে পড়ল যে লোকটা একটু অদ্ভুতভাবেই এক নজর দেখে নিল আমায়। —না, চা টোস্টের আমার দরকার ছিল না। ও বিষয়ে আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চেলা, তা জানই। আর চা-পান যে বিষপান তা রূপ-রং দেখলে এখানে যতটা সত্য বোধ হয় অন্য কুত্রাপি ততটা নয়। তবে দিশেহারা বলে একটা কথা আছে জান তো? পলটুরও ইঙ্গিত ছিলই, আমারও মনে হলো, চৌমাথার চায়ের দোকানের মালিক, এ যেন সর্বজ্ঞ, এর খদ্দের হয়ে গেলে যেন একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে সদ্য সদ্য।

হলোও। দোকানী ছোঁড়াটিকে ভালো করে কাপ ধুয়ে এক নম্বরের ডিবে থেকে তাড়াতাড়ি করে চা দিতে বলে দিয়ে অযথাই তালি দিয়ে হাত দুটো ঝেড়ে নিল।

বলল—"এ দুখন ভাই, তু বাঙ্গালীবাবুকো জরা পহুঁছা না দে শকব?"

ড্রাইভারটা আড়চোখে একটা ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর করল—"নোকরি খোয়ায় সে বান?"—অর্থাৎ চাকরি খোয়ালে চলবে আমার?"

দোকানী আমায় জানাল কোম্পানী বড্ড কড়া এ বিষয়ে।

"তা হলে উপায়?"—আমি আবার ব্যাকুল প্রশ্ন করলাম।

খুব অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে ওদের দুজনের একটু দৃষ্টি বদল হয়ে গেল। দোকানী অল্প একটু এদিকে সরে এসে গলা নামিয়ে বলল—"একটা

মস্ত বড় ঝুঁকি নেওয়া তো হুজুর, টের পেলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি। তা একটা এই হাতে গুঁজে দিলেই রাজী হয়ে যাবে।"

"এই" কথাটার টীকাস্বরূপ ডান হাতের মধ্যমা আর অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে একটা কৃত্রিম টাকা বাজিয়ে দিল।

কূল পেলাম। বললাম—"যা চায় দোব, তুমি একটু বলে দাও ভাইয়া।"

ওটা দেখছি ওর মুদ্রাদোষই; একটু মনের মতো হয়ে কোন কাজের নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আপনিই এসে পড়ে। আবার সেইভাবে একটা তালি দিয়ে হাত দুটো ঝেড়ে নিয়ে স্বস্থানে সরে বসল দোকানী, তারপর এবার বেশ গলার স্বর তুলেই বলল—"না, সে হবে না, কোনমতেই দোব না হতে। একটা মানুষ বিপদে পড়েছেন, পাটনায় না পৌঁছাতে পারলে ওঁর মকদ্দমাই এক-তরফা হয়ে যাবে, আর ও কিনা চাকরীর ভয়ে···মানুষের একটা উপকার যাতে করতে পারা যায় না এমন চাকরী গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি?"

গরগর করতে করতে মোটগুলোর দিকে চেয়ে পলটুকে বলল—"আব হো, উঠাব। উতারে না সকি দুখন ভৈয়া। হম বানি না।" —(এসো না, তুলে দাও। দুখন ভৈয়া পারবে না নামিয়ে দিতে। আমি তো রয়েছি।)

আবার অতি সূক্ষ্ম একটু দৃষ্টি-বিনিময়। দুখন ড্রাইভার নিরুপায়ভাবে কণ্ঠস্বরটা নরম করে বলল—"আব তু কহতার ত কা করি? নোকরী যাই ত চা বানাবেকে দিহ দুকানমে।" (তুমি যখন বলছ তখন আর করি কি? চাকরিটা গেলে দোকানে চা তোয়ের করবার কাজটা দিও।)

আমার কাছে কি আজ দুঃখকষ্ট ঘেঁসতে পারে? আসেও তো তাকে যে এমনি করে মিলিয়ে যেতে হবে হাওয়ায়।

ছাড়া পেয়ে মনটা আবার সেইখানে চলে গেছে। শালুকফোটা ডোবার ধারে ফুলে বোঝাই কদম গাছের নীচে দুটি শিশু—অনাদৃত,

তা হোক, আমি চিনেছি, আমি জেনেছি জীয়ন মুশহরের তপস্যা হয়েছে সফল।

আমারও নয় কি? এত যে বাধাবিঘ্ন—নৈরাশ্য সেটা কি একটা অচেষ্টা-প্রসূত তপস্যাই ছিল না আমার, পুণ্য শারদ-মধ্যাহ্নে এই তীর্থ পরিক্রমার জন্যে?

আর উদ্দেশ্যটা অজ্ঞাত ছিল বলেই সেই তপস্যার ফলপ্রাপ্তিটুকু আরও বিস্ময়কর, আরও মধুর নয় কি?

একটা যে হাওয়া রয়েছে তাতে লরির খোলা চুন উড়িয়ে গায়ে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ধূলাও আছে তার সঙ্গে। তপস্যার সংশয় এসে পড়েছে বোঁক মাঝে মাঝে। তবু এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে পলটুকে বলেই যাই। যদি ভুলই হয় আমার তো ভুলের ওপরই থাক না একটা আশা এই দরিদ্র পরিবারে; একটা বিশ্বাস যা প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে তা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলই বা আমার ভুল আশ্বাসে। অন্তত দরিদ্র ঘরের অভাব অনটনের মধ্যে লালিত শিশু—সে একটু আদর-আস্বাস্থ্য তো পাবে।

ড্রাইভারের সীটে দরজার পাশে উঠে বসলাম। পলটু মোটগুলো এনে পায়ের কাছে রেখে দিল। ড্রাইভার উঠে এসে স্টীয়ারিং ধরে স্টার্ট দিল।

একটা টাকা পেয়েছে পলটু। ঘরেও একটা। দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে, বার কয়েক সেলাম করেছে, শেষকালেও একটা করবে।

বলি? বলে দিই কথাটা? চাকা ঘুরল, হাওয়ায় পেছন থেকে একমুঠা চুন উড়িয়ে ছড়িয়ে দিল বুকে পিঠে।

"একটা কথা পলটু—"

"কী বড়াবাবু?"—চলতি বাসের সঙ্গে পাশে পাশে ছুটে চলছে পলটু। অবশ্য স্পীড দেয়নি ড্রাইভার।

"আমার মনে হয় তোমার পরদাদার তপস্যা হয়েই গেছে সফল···এসেই গেছেন···"

"কী বলছেন, বুঝলাম না বড়াবাবু—কে এসে গেছেন?···"

স্পীড নিয়েছে লরি। গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম—"ছেলেটার দিকে একটু নজর রেখো—রামকিষণার কথা বলছি—মারধোর করো না যেন!! ··কে জানে···হয়তো···সেই যোগী মহারাজের কথা—"

একটা জোট-বাঁধা চক্রান্তের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলাম নাকি? যাতে ড্রাইভার আছে, দোকানীটা আছে, হয়তো পলটুও আছে। কেন বলছি?

মাইল চারেকও যাইনি, পেছনে খানিকটা দূরে একটা টানা হর্নের শব্দ। মনটা ওদিকে পড়েছিল বলে গলা বাড়িয়ে দেখতে যাব, ড্রাইভার হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল, বলল—"মুখ ঘোরাবেন না, বাবু; চুন এসে পড়বে চোখে।"

জিজ্ঞেস করলাম—"হর্ন দেয় কিসের?"

"বলা যায় না তো, হয়তো কোন লরি—ক্রমাগতই তো চলছে···"

পাশ কাটিয়ে দিয়ে চলার মাঝেই একটা বাস হর্ন দিতে দিতেই ধূলি উড়িয়ে বেরিয়ে গেল ডান দিক দিয়ে। বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলাম—"মজঃফরপুরের বাসটাই তো, না?"

"মনে তো হচ্ছে।" নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলাম—"একেবারে বিগড়ে গেছে বললে না?"

"তাই তো দেখলাম তখন।"

এই রাস্তারই ড্রাইভার, বাসের হর্ন ভুল না করাই সম্ভব। অন্তত এটা একেবারে ধ্রুব সত্য যে, পাছে দাঁড় করাই সেই জন্যে ঘুরে চাইতেও দিল না। দুটো প্রশ্নেই মনের বিরক্তির ভাবটা ফুটে উঠেছে, এবার বেশ সোজা রূঢ় করেই ঐ কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সামলে নিলাম। বুঝলাম দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছেন আমার ওপর। এই অযথা অধৈর্যে কোন ফল নেই, বরং উল্টো উৎপত্তি

হওয়ারই সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে দুটো কটু কথা বলবার জন্যে জিভ চুলকাল—এ দুষ্টু সরস্বতীরই জো পেয়ে এসে ভর করা বইকি।

তাঁকে ঠেলে সরাতে প্রায় মাইলখানেক গেল লেগে, মনের যত শক্তি আছে সবটুকু নিয়োগ করেও। তারপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বললাম—"না ভেইয়া, ভেবে দেখছি তুমি ঠিকই করেছ। বোকামি করে দাঁড় করাতে গেলে আবার কোথায় বিগড়ে বসে থাকত।"

"বিগড়োনই ওদের কাজ।"

"খুবই ঠিক কথা বলেছ। তুমি আর একটু জোর করে দিতে পার না?"

দেখেছি অনেক সময় এক একটা কথা বেশ তালের মাথায় মনে পড়ে গিয়ে অনেক মুশকিল আসান করে দেয়, অনেক বিপদকে রাখে ঠেকিয়ে। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল পঞ্চানন-বাবুর কথা। আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন, এদিকে একটু আত্মীয়তাও ছিল আমাদের সঙ্গে। যখনকার কথা তখন সবেমাত্র কিছু দিন হল নতুন আরম্ভ করেছেন কাজ।

কোন কারণে আমরা সেদিন একটু উৎসবের মুডে রয়েছি, শখ হয়েছে লছমীসাগরে নাইতে যেতে হবে। লছমীসাগর রাজার একটি বিখ্যাত পুকুর আমাদের এখানে। চারিদিকে উঁচু পাড়, ফুল আর নানারকম দুষ্প্রাপ্য ফলের বাগান। চারিদিকে চারটে বড় বড় নাইবার ঘাট। স্নানের হুকুম ছিল, তবে অনেকটা নিয়ম কানুনের মধ্যে। যেমন হয়ে থাকে, কার্যত এই নিয়ম-কানুনের ব্যাপারটা যে লোকটা রাখবারি করত তার মর্জির সঙ্গে একার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে চাইলে নাইতে পারো, নতুবা নয়। এবং, যেমন স্বাভাবিক, সে ছেলেদের নাইতে দিতে একেবারে ছিল নারাজ। বিশেষ করে বাঙালীর ছেলেদের তো নয়ই। লোকটাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যেত না এর জন্যে। পুকুর তোলপাড় করতে বাঙালীর ছেলের জুড়ি নেই। পুকুর-নালা-

নদীর দেশের ছেলে, আর সবার যদি জলে নামলে রক্ত ঠাণ্ডা তো বাঙালীর ছেলের রক্ত যেন আরও টগবগিয়ে ওঠে। তার ওপর কি জল, কি ডাঙা—সর্বত্রই অন্য জাতের ছেলের চেয়ে দুষ্টু বুদ্ধিটা একটু বেশি সক্রিয়। পুকুর থেকে উঠেই চার পাড়ে ফলের বাগান—পীচ, সপাটু, দালিম, পেয়ারা, তুঁত; আম-লিচুর সময় আম, লিচু—পুকুর গুলিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে উঠে কে কোন পাড়ে গিয়ে গাছ হালকা করছে থৈ পেত না লোকটা। সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। সুতরাং, ধুলো পায়েই বিদায় করে দিত ; হবে না। আমরা আবার সেদিন গেছি দল-বেঁধে, বেশ একটি পুরু দল। রাজ স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার রয়েছেন, অনেকদিন পরে দিব্যি সাধ মিটিয়ে...

না, সাধ মিটিয়ে পুকুর তোলপাড় নয়,—রাজস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার সঙ্গে রয়েছেন, কড়া Disciplinarian (এ কথাটার বেশ নিক্তি ধরে অনুবাদ করা যায় না কেন বলতে পার? ওদের অর্থে নিয়মানুবর্তিতা আমাদের মধ্যে কি কোনকালে ছিল না?)। আমরা একটু সাধ মিটিয়ে নাইব বলেই গেছি, কিন্তু হল না।

একটু এগিয়ে পড়েছিলুম আমরা। তার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, শুধু ছাত্রের চাল আর শিক্ষকের চাল এক হতে পারে না বলেই। পঞ্চাননবাবুর Discipline আবার একেবারে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত নেমে এসেছিল। মেপে মেপে পা ফেলে বাংলা দেশের প্রথায় বুকে তেল মালিশ করতে করতে আসছেন, বিমর্ষ মুখে আমাদের ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি হল?"

"দিলে না স্যার নাইতে।"

একটু যেন চিন্তা করে নিলেন কি একটা, তারপর বললেন—"দিলে না, তার কারণ নিশ্চয় ওর পুকুরে নাইতে এসে ওরই ওপর চোখ রাঙিয়েছ।"

"না স্যার।"

"কিচ্ছু করনি—ঝগড়া বচসা, কিচ্ছু নয়?"

"কিন্তু ওর পুকুর নয়তো স্যার।" একজন বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে উঠল।

ওঁর মুখে সূক্ষ্ম একটু যে হাসি ফুটল তার কারণ পরে টের পেলাম অবশ্য, একটু চটিয়ে আসল কথাটা বের করে নিলেন আর কি। প্রশ্ন করলেন—"তা হলে হয়েছিল একটু?"

সবাই মাথা হেঁট করে রইল। ভয়ানক কড়া Discipline-এর মানুষ তো, একটা মিথ্যা আরম্ভ করলেও শেষ রক্ষা করা যেত না।

ঝগড়াটুকু যে দরকার ছিল, কাজে লাগাবার জন্যেই প্রশ্ন করছিলেন—সেটাও অবশ্য পরে টের পেলাম।

বললেন—"চলো, এসো আমার সঙ্গে।"

"ও মিছিমিছি বলবে ঝগড়া করেছি স্যার।"

"এমন আর কি তোমাদের চেয়ে বেশী দোষ করবে?···চলো।"

—অর্থাৎ আমরাও তো মিছিমিছিই বললাম, করিনি ঝগড়া।

রাখওয়ার অর্থাৎ রক্ষীর ছোট্ট চালাটা বেশ খানিকটা দূরে। তবে আমাদের খেদিয়ে নিশ্চিন্ত না হতে পেরে ও তখনও ঘাটেই তুঁত গাছটার নিচে বসেছিল, নিচু চোখ একটু তুলে দেখলাম, আমাদের ফিরতে দেখে কটমটিয়ে চেয়ে আছে।

পঞ্চাননবাবু বুকে তেল রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে গেলেন, তুঁততলায় পৌছেই প্রশ্ন করলেন—"ইয়ে তালাব আপহিকা জিম্মামে হ্যায়?"

পঞ্চাননবাবুর অবশ্য বয়স হয়েছে, তবু লক্ষ্য করেছিলাম লোকটা দূর থেকে 'যুদ্ধং দেহি'র দৃষ্টিতেই চেয়ে রয়েছে ওঁর দিকে, প্রতিপক্ষের দলপতিই তো।

প্রশ্নটা শুনেই কিন্তু প্রায় মিলিটারি কায়দাতেই দাঁড়িয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকে দিল, উত্তর করল—"জী হুজুর।"

ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় বুঝলে না। হিন্দীতে "আপ" কথাটার

মানে হচ্ছে 'আপনি'। এখন, স্বাধীনতার পর থেকে শুনেছি নাকি বিচারক পর্যন্ত চোরকে 'আপ' বলেই অভিহিত করবেন এরকম নিয়ম হয়েছে; কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন অত খাতিরের সর্বনাম রাখওয়ার চৌকিদার তো দূরে থাক, আরও অনেক উঁচু স্তরের মানুষেরও স্ব'প্নর অতীত ছিল।

যেমন বলেছি, অভীপ্সিত ফলটা সত্য সত্যই পাওয়া গেল। শানের বেঞ্চটা ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে পঞ্চাননবাবু বসলেন তার ওপর; একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"এ তো দেখছি মস্ত বড় দায়িত্ব আপনার, এত বড় পুকুর, ফলফুলের বাগান। তা হলে তো ঠিকই করেছেন দেখছি। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?"

"কি ঠিক করার কথা বলছেন হুজুর?" নীচেই উবু হয়ে বসে প্রশ্ন করল লোকটা।

"এই ছেলেদের ভাগিয়ে দিয়ে। ছেলেদেরই পাল তো, পুকুর তোলপাড় করবে, তারপর ফুল তুলবে, ফল পাড়বে…"

জিভ কাটল লোকটা। বলল—"ভাগিয়ে কখনও দিতে পারি হুজুর, আপনাদের ছেলেপুলে। তবে বাবুরা এসেই গালমন্দ আরম্ভ…"

"না স্যার, ওই বরং…"

"হয়েছে!"—দাবড়ানিই দিয়ে উঠলেন পঞ্চাননবাবু, তারপর হিন্দীতেই বললেন—"এত বড় দায়িত্ব যার ঘাড়ে সে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তোমরাই করেছ ঝগড়া। ও বেচারির স্বার্থ কি?"

তারপর ওকেই বললেন—"আপনি বলবার আগেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম ওরা একটা কিছু হাঙ্গামা বাধিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। আমি হচ্ছি রাজ স্কুলের মাস্টার। গোলমালে বোধ হয় ভালো করে মুখ চিনে রাখতে পারেন নি, দেখে রাখুন। স্কুলে এসে নালিশ করে চিনিয়ে দেবেন।"

আমাদের বললেন—"এবার তোমরা যাও।"

"হুজুর, এবারটা মাফ করে দিন।" লোকটা হাত দুটো কচলাতে কচলাতে দাঁড়িয়ে উঠল।

"কাকে? ওদের? কী বলছেন আপনি!"

"আজ্ঞা হাঁ, ওঁদের কথাই বলছি। এবারটি মাপ করুন। স্কুলের ছেলেই তো।"

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবলেন, তারপর আমাদের বললেন—"আচ্ছা যাও, আর এমুখো হয়ো না।"

"হুজুর স্নানটুকুও করে নিতে দিন"—যখন এসে পড়েছেন, ছেলেমানুষ সব।"

"ছাখো, অথচ বলছিলে এই লোক ঝগড়া করেছে তোমাদের সঙ্গে। বেশ, দুটো করে শান্তভাবে ডুব দিয়ে উঠে এসো, যাও!"

"না বউয়া সব, তোমাদের যেমন খুশি স্নান করে নাও।"

—এত মোলায়েম মেজাজের লোক। সম্ভব ওর পক্ষে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা! অনুমতিটুকু পেয়ে ঘাটের দিকে এগুতে এগুতে শুনলাম—একটু প্রশ্রয়ের চাপা গলায় বলছে—"ছেলেমানুষ সব হুজুর, একসময় আমরাও তো ছিলুম, তাতে আবার স্কুলের ছেলে, একটু বেশী দুরন্ত হয়ই..."

পঞ্চাননবাবু হেঁকে বললেন—"কাটতে পার সাঁতার, একটু কাটবে তো, কিন্তু খবরদার ফলফুলের দিকে যদি যাও..."

অতটা সাহস হওয়ার কথাও নয়, উনি নিজে রয়েছেন ঘাটে বসে, তবে ফিরে যখন এলাম, উনিও স্নান করে কাপড় কেচে উঠে এসেছেন, দেখি একটি ছোট্ট ঝুড়ি করে এক ঝুড়ি ফল নিয়ে শানের নীচে বসে আছে লোকটা। পীচ, পেয়ারা, সপাটু, তুঁত। বলল—"হুজুর, বউয়া লোকদের বাঁটিয়ে দিন আপনি।"

বেশ একটু দমেই গেছি তো, আমরাই তো দোষী সাব্যস্ত হলাম; সেই জন্যেই রাস্তায় এসে নালিশ আর পরিচয়ের হুড়াহুড়ি পড়ে গেল খানিকটা—

"ভয়ানক বদমাইশ স্যার, লাঠি না উঁচিয়ে কথা বলে না, ঐ যে খেঁটে লাঠিটা পেছনে লুকিয়ে ধরে ছিল আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময়..."

"বাংলা দেশ ঘুরে-আসা স্যার...এগুলো আরও বদমাইশ হয়... বলে কি স্যার?—বাঙ্গালীরা জলের জানোয়ার—জল ঘোলানই কাজ ওদের..."

হ্যাঁ, পরিচয় দেওয়ার সময় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি; নিয়মানুবর্তী হওয়ার সঙ্গে আবার খুব প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন পঞ্চাননবাবু।

চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর করলেন—"কার্য উদ্ধারটা তো করে আসতে হবে, যার জন্যে যাওয়া।"

মজঃফরপুরের লরি ড্রাইভারটার কথা বলছিলাম। বুঝছি ওরাই যোগসাজস করে আমায় বাসটার জন্যে অপেক্ষা করতে দিল না; দেখলাম ওই আমায় একটা ভাঁওতা দিয়ে বাসটা পাশ করিয়ে দিল, থামাবার সুযোগটাও নষ্ট করলে ওই, তবু ওরই সাধুতা আর বুদ্ধির বলিহারি দিতে হল। সান্ত্বনা এইটুকু রইল যে বুদ্ধির বলিহারি দেওয়াটায় তেমন কিছু মিথ্যা বলা হয়নি অন্তত। কূট বুদ্ধিও তো বুদ্ধিই।

কথাটা কি জানো? গৃহের নীতি আর পথের নীতি এক করলে দুটোই অচল হয়ে পড়ে। তা যদি বললে তো সব কিছুরই নিজের নিজের আলাদা নীতি আছে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে "ইতি গজ" —বলিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেই, ঘরে পূজার আসনে বসিয়ে নিশ্চয় বলাতেন না।

সব অন্যায় হজম করে নিয়ে বলিহারি দিয়েই বললাম—"ভাইয়া, একটু জোরে চালাও, ট্রেনটা আমার ধরিয়েই দিতে হবে কোনরকম করে কপাল জোরে তোমার মতন ড্রাইভার পেয়েও যদি ফেল করতে হয়..."

ব্যস, যেটুকু পারলাম করা গেল। এর পর বরাত; গাড়ি পেয়ে যাই, বহুত আচ্ছা, না পাই, করছি কি ?”

বরাত আর চেষ্টা, দৈব আর পুরুষকার, এ দুটোর হদিস পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত জীবনে। তবে এটুকু দেখেছি, দুটোকেই ধরে রাখা ভালো। বরাতটা হচ্ছে আমদের জীবনের ছুটির দিক। “কি আর করা যাবে ?” বলে মাঝে মাঝে পাল নামিয়ে হাল তুলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকবার একটা বিপুল সার্থকতা আছে। নইলে হাল টেনে আর পালের মোড় ঘুরিয়েই মরতে হয়, তাতে চলমান জীবনের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হয় আমাদের।

হঠাৎ কে যেন সেই কথা মনে করিয়ে দিল আমায়। কে যেন আলোর চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিল—ওহে একবার চোখ মেলে দেখো কী বঞ্চিতই না হচ্ছ !

সত্যিই আলোর চিঠি।

আমাদের ট্রাকটা চলছিল রাস্তার দু ধারে দু সারি ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মধ্যে দিয়ে, হঠাৎ সেগুলো শেষ হয়ে গিয়ে দু' দিককার আলো এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখে-মুখে। শরতের দিন-শেষের আলো, খুব সূক্ষ্ম একটু হলুদের ফাগ ছড়ানো তার গায়ে, যেটা আর দু দিন বাদেই হেমন্তে গিয়ে আরও গাঢ় হয়ে উঠবে। আলোর ঠিক এই রূপটি আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শরতের অস্তরাগ —সে করবে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ; এই তো জানি। আকাশে মেঘের স্তূপে স্তূপে চলবে রঙের খেলা, নীচেও চলবে সেই খেলাই—ধানের ক্ষেতে, দীঘির জলে, কাশের বনে ; ধরণী তো আলোর সাতটা রঙকে শত বৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তুলতে শরৎকালের মতো আর অন্য কোন ঋতুতেই তয়ের হয় না। দেখেও তো আসছি এতক্ষণ দুধারের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। এখানে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আকাশটা একেবারে পরিষ্কার। পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছি না বলেই আরও মনে হচ্ছে তাই, নীচেও ধানের ক্ষেত ছাড়া আর কিছু

নেই—একটানা মাইলের পর মাইল, আর এর মাঝখানে সেই নিরাভরণ আলোক। মনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। আলো যেন এখানে এক ধ্যানমৌন সন্ন্যাসী, নগ্ন, অচপল, অবিকৃত, চরণ দুটি পদ্মাসনবদ্ধ, জটাজুট অম্বরে লুপ্ত।

ড্রাইভারের হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বললাম—"একটু আস্তে করে দিতে পার না এখানটায়?"

"আপনার ট্রেন ধরতে হবে না বাবু?" আপনিই তো বললেন—"একটু বিস্মিতই হয়েছে। আমিও একটু অপ্রতিভই হয়ে গেছি, মনে আসা মাত্র কথাটা বলে দিয়ে। মনের কোথা থেকে যে কথাটা উঠে এল, এখন ওকে কী করে বলি? কি করে বোঝাই, গাড়ির কনেকশন আবার অনেক পাব, সারা জীবন ধরে; কিন্তু আজ এই বিশেষ জায়গাটিতেই এই যে বিশেষ লগ্নটি আমার জন্যে এসে পড়েছে, একে আর কবে ফিরে পাব এ জীবনে? জীবনের পর জীবন নিয়ে যে অনন্ত জীবন তাতেই বা আর কবে পাব ফিরে?

লোকালয় এসে পড়েছে। আবার গাছপালা, বাড়িঘর, পুকুর বাগান, শহরটা আস্তে আস্তে আরম্ভ হচ্ছে। লরির গতিবেগ আপনিই এল কমে, হর্নের আওয়াজ গেছে বেড়ে, আর শুধু আমাদেরই নয়। এরই মধ্যে কখন সূর্যাস্ত হয়ে গেল টের পাইনি।...অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে, শহরের বিজলীবাতির আওতায় এসে পড়েছি আমরা। আমার আকস্মিক পরিক্রমা শেষ করে আবার ফিরে এসেছি মজঃফরপুরে। আমার এই কটা ঘণ্টার টাটকা অভিজ্ঞতা, অমন বর্ণাঢ্য ভুলের ফসল, স্বপ্নের মতো ফিকে হয়ে এসেছে; তার জায়গায় রূঢ় বর্ত্তমান তার যত সমস্যা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—বুকটা ধড়কড় করছে—গাড়ি পাবো তো?—না পেলে!

আরও একটা ছিল আপাতত। তবে সেটা এত সুদূর, এখন প্রায় অসম্ভবের কোঠায় যে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি মেরে

একটু অস্বস্তি জাগালেও তেমন কিছু চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ আশ্চর্য এইটেই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল সত্য, প্রবলভাবেই সত্য!

আর গাড়ি? আমি প্রায় মিনিট আষ্টেকের মাথায় পৌঁছেছি; লরিটা স্টেশন প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে একটা কুলি ডেকে তাকে মোটঘাটগুলো নামিয়ে নিতে বললাম—পাটনার গাড়ি ধরতে হবে ···এপারে, না, পুল পেরিয়ে?

ধীরে সুস্থে মাথায় পাগড়ি বাঁধতে দেখে বিরক্তভাবেই তাগাদা দিতে জানালো—"গাড়ি এক ঘন্টা লেট বা।"

যেটাকে কিন্তু সুদূর আর প্রায় অসম্ভব মনে করেছিলাম, সেটা শুধু সামনেই নয়, একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ল।

আমি এই মজঃফরপুরে এক সময় অনেকদিন গেছি কাটিয়ে, দুইবারে প্রায় বছর চারেক। ছিলামও দুটো বড় বড় স্কুলের শিক্ষক হয়ে। এদিকে খেলাধূলা ছিল, বাঙালীদের সব প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগ ছিল; সব মিলিয়ে পরিচিতের সংখ্যা খুব বেশী শহরের মধ্যে। মাস্টারি কাজটাও আর কিছু না হোক, বেয়াড়ারকম খাতির আর প্রণাম কুড়বার কাজ।

শহরের প্রান্তভাগে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা আস্তে আস্তে মনটাকে অধিকার করে ফেলছিল, চুনের ট্রাক গিয়ে দাঁড়াবে আর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পাশ থেকে—'পরনাম স্যার।' কিংবা নমস্কার মাস্টারমশাই। কিংবা—'এই যে বিভূতিবাবু! উঃ কতদিন পরে দেখা! তা আপনি হঠাৎ···"

খোলা চুনের গাদার ওপর দৃষ্টি পড়ে উনিও অপ্রস্তুত, আমার মুখেও কথা যোগাচ্ছে না।

যা ভয় করছিলাম তা-ই কি ঘটতেও হয়? তাও যদি যখন লরিওলাটাকে ভাড়াটা দিচ্ছি সেই সময় দেখতে পায়, তা হলেও খানিকটা বাঁচোয়া থাকে, ও হতভাগা এসে দাঁড়াল যখন ভাড়া চুকিয়ে

দাঁড়িয়ে আছি। কুলি মোট মাথায় তুলে দেওয়ার জন্তে লোক খুঁজছে।

"পেন্নাম মাস্টার সাহেব।"

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, এই আশঙ্কাই তো করছিলাম। পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ ডাগড়া চেহারা, খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, বয়স পঁচিশ কি পঁয়ত্রিশ বোঝা শক্ত। আশীর্বাদটা সেরে একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম—"তোমায় কিন্তু চিনতে পারছি না বাপু। ভুল কর নি তো?"

"আরে ব্বাপ! আমি ভুল করব!" বাঁ হাতের ওপর ডান হাতের উল্টা পিঠটা ঠুকে একটু হেসেই উঠল কেন জানি না, বলল—"বলে এক অচ্ছর কারুর কাছে পড়লে চিরকাল সে কথা মনে রাখতে হয়, আমি তো হুজুরের প্রাইভেট স্টুডেন্টই ছিলুম। মনে পড়ছে না?"

লরিটার দিকে একবার একটু ঘাড় উঁচিয়ে চাইল। বললাম—"না, ঠিক……"

"আমার নাম রামবুঝাওন মিশির। এবার মনে পড়ছে?"

'মনে পড়ছে' বললে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী কি 'পড়ছে না' বললে, মনে মনে ঠাহর করবার চেষ্টা করছি, কুলি বলল—"কেউ তো নেই, মোটগুলো একটু তুলে দিতে হবে।"

পা বাড়িয়েছি, রামবুঝাওন তাড়াতাড়ি ঘুরে ধরল বাক্সটা, "সে কি স্যার! আমি রয়েছি কি করতে?"

সবগুলো তুলে দিয়ে সেইভাবে উল্টো হাতে তালি বাজিয়ে একটু হেসে বলল—"আজ কত বছর পরে একটু সেবা করবার সৌভাগ্য হল স্যার?"

চুনের লরির দিকে কয়েকবারই চোখ ছুটো গিয়ে পড়েছে এর মধ্যে, একটু তেরছাভাবে।

বললাম—"তা হবে বৈকি……"

কুলিটা এগিয়েছে। কথাটা কেটে দিয়ে বললাম—"আচ্ছা, আসি তা হলে, সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।"

"তা তো পাবেনই স্যার; কী স্নেহটাই যে পেয়েছি আপনার কাছে! চলুন গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি; কত বছর পরে যখন পাওয়া গেছে দর্শন।"

চলতে চলতে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই বলেছিলাম আনন্দ পাওয়ার কথা। চিনতে পারছি না, একটা অস্বস্তিই বোধ করছি। ও চেনে, আর দেখলেও এই রকম অবস্থায়—মাস্টারমশাই চুনের লরি থেকে নামছেন, অস্বস্তিটা আরও যেন বেড়েই যাচ্ছে। বললাম—"আমার গাড়ির এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। লেট আসছে। তারপর জল নিয়ে ছাড়তে আরও খানিকটা বাড়িয়েই নেবে, তুমি আর কেন......"

"তাই নাকি!" —পুলের ওপর উঠেছি, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, কুলিটাকে বলল—"এই দাঁড়া।"

আমিও দাঁড়িয়ে পড়েছি আপনা হতেই, সেই রকম চোখ বড় বড় করে হেসে আর উল্টো হাতের তালি দিয়ে বলল—"ও লেট হয়েছে আমার ভাগ্যে স্যার, ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় পাওয়া যাচ্ছে তো চলুন আমার বাসায় নাস্তা-পানি ক'রে আসবেন একটু। না, কোনমতেই ছাড়ছি না। মুখ-হাত ধুয়ে একটু নাস্তা-পানি........ইস্. চুন উড়ে উড়ে কি চেহারা হয়ে গেছে স্যার! আমি মনে করেছিলুম, মাস্টার-মশাইয়ের বুঝি সব চুল পেকে গেছে। ....দাঁড়ান, ঠিক মনে পড়ে গেছে। আপনার চুনের গাড়িটা বোধ হয় যায়নি। দাঁড়াতে বলে দি গে।"

ভিড় আছে পুলে একটু, তারই মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে খানিকটা গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল—"আপনারাও আসুন স্যার। এই কুলি, চলো!"

কী এক নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া গেল। একটু ভ্যাবাচ্যাকা

খেয়েই গেছি, সামলে নিয়ে কুলিটাকে বললাম—"চল্, এগো। প্ল্যাটফর্মেই গিয়ে বসব। একটু তাড়াতাড়ি চল।"

দূ-ত্বটা যতখানি বাড়িয়ে ফেলতে পারি এই সুযোগে। হঠাৎ কোথা থেকে এক বিপদ এসে জুটল দমকা।

সিঁড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েছি, সেই রকম ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল।

"এই কুলি, দাঁড়াও। ...আপনার চুনের লরিটা চলে গিয়েছিল স্যার, আমি একটা ট্যাক্সি ঠিক করে এলুম, চলুন।"

বিরক্তিটা চাপবার চেষ্টা করলাম না; একটু বেশী স্পষ্টই হয়ে ফুটে থাকবে মুখে, একটু থতমত খেয়ে চেয়ে থেকে বলল—"তা হলে তাই করুন স্যার। আর ও ব্যাটাও জব্দ হোক।"

এগিয়েছি আবার। প্রশ্নের দৃষ্টিতে ঘুরে চাইতে বলল—"ওই ট্যাক্সিওয়ালার কথা বলছি। এইটুকু তো পথ, এর জন্যে গরজ দেখে আড়াই টাকা চার্জ করে বসল, যেতে-আসতে পাঁচটা টাকা, হল্টেজ আলাদা। থাক শালা—ব'সে ব'সে যত পারিস হল্টেজ তোল এখন। কি বলেন স্যার ?...ঐ যে আপনার চুনের লরিটা..."

"কিন্তু আমার চুনের লরি, তোমায় কে বললে ?"

"নয় স্যার ?" —একটা যেন ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে আমি আর না-দাঁড়ানোয় তখুনি আবার চলতে আরম্ভ করে দিল। সভাপতি নিয়ে যাওয়ার মতো ক'রে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আলাপ করতে করতেই নিয়ে যাচ্ছিল, এবার খানিকটা চুপচাপই গেল। তার মধ্যে ঘুরে শুধু বার দুই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিল। একটা বেঞ্চের সামনে এসে কুলিটা দাঁড়াল, বলল—সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িটা এইখানেই দাঁড়াবে। রামবুঝাওন মোটগুলো নামিয়ে দিল। বেঞ্চটা ভরাই ছিল। "মাস্টার সাহেব হ্যাঁয় মাস্টার সাহেব হ্যাঁয়"—বলে তারই মধ্যে অনুরোধ উপরোধ করে আমার জন্যে একটু জায়গা করে দিল, তারপর একটু

জবরদস্তি করে কানুন দেখিয়েই তুজনের তুটো পুঁটলি নামিয়ে নিজেও একটু জায়গা করে নিল আমার পাশে। বেশ একটু চিন্তিত। যেন হিসাবের ভুলটা কোথায় কি করে হলো বুঝে উঠতে পারছে না। তুয়ে-তুয়ে মিলে চারই হয়, চিরকালই এই দেখে এল, হঠাৎ পাঁচ হয়ে বসল কি করে!

আমিও রয়েছি নিজের চিন্তা নিয়ে। এমনি এক ঘণ্টা লেট হয়ে রাত আটটার জায়গায় প্রায় সাড়ে দশ-এগারোটা হয়ে যাচ্ছে—গাড়ি পৌছতে প্রায় বারোটা—এন-ই আরের গাড়ি—একবার লেট হলে আরও লেট করবারই ঝোঁক থাকে—কি হবে, কখন পৌছাব, কিছুরই যেন হদিস পেয়ে উঠছি না। এর ওপর এই এক উপদ্রব এসে জুটল কোথা থেকে! সমস্ত দিন যে ধকলটা গেল, ঘোরাঘুরি, মনস্তাপ, বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। হাতে সময় রয়েছে, ইচ্ছে ছিল সোজা ওয়েটিং রুমে গিয়ে স্টেশনের হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে রাতের খাওয়াটাও এইখানেই সেরে নেব; সে তো ওর খাতিরের অত্যাচারের ভয়েই হলো না, এইখানেই স্টল থেকে একটু যে আনিয়ে নেব, সে সাহসও হচ্ছে না...

"স্যার মাফ করবেন।" —কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করলাম—"কি?"

"ব্যস্, ঠিক পাঁচ মিনিট, যাব আর চলে আসব।"

পাঁচ বছর এমন কি অগস্ত্য-যাত্রা হলেও যে আমার কোন তুঃখ নেই, এ কথা কি করে বোঝাই? কিন্তু যা যাত্রা করে বেরিয়েছি, এত সহজ হওয়ার কি উপায় আছে? ও উঠতেই একেবারে পাশের লোকটি ওর পুঁটলিটা তুলে নিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল—"বাঃ! বাঃ! অমনি পুঁটলি উঠে আসছে, দিব্যি তামাশা তো!"

"আপনি উঠে যাচ্ছিলেন..."

"পাঁচ মিনিটের জন্যেও নিজের জায়গা ছেড়ে একটু কাজে যেতে

পারবে না লোকে? আর পুঁটলির জন্যে বেঞ্চ পেতে রেখেছে কোম্পানী! বাঃ!"

একটু রূঢ়ভাবেই ওর পুঁটলি সুদ্ধ হাতটা ঠেলে আবার বসে পড়ল।

"আচ্ছা জবরদস্তি তো!" —লোকটা একটু ক্ষীণজীবী, নিরুপায়-ভাবে মন্তব্যটা করে আরও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রামবুঝাওন আমার দিকে ঘুরে বলল—"ও কি বলছে, কানে তোলবার দরকার নেই স্যার—মানুষ দাঁড়িয়ে থাক, পুঁটলি থাক ব'সে, দেখুন না আব্দার! ...আমি একটা কথা জিগ্যেস করছিলুম স্যার, অবিশ্যি যদি অনুমতি দেন, নইলে থাক। গুরুর অনুমতি না পেলে—বাবুজী বলেন—তুলসীদাসজী তাঁর রামচরিতমানসে নাকি বলে গেছেন..."

"কি কথা—বলোই না।" —বাধা দিয়ে বললাম।

"চুনের লরিটা আপনার ছিল না?"

"বিশ্বাস হলো না তোমার? গুরু-বাক্যই তো।"

"আরে ব্বাপ! অবিশ্বাস করতে পারি কখনও! কী যে বলেন স্যার!" —দু হাতে নিজের দুটো কান স্পর্শ করল।

"তা হলে?"

"মানে...কথা হচ্ছে স্যার, আপনি প্রায়ই বলতেন—সেই যখন পড়াতেন আমায়—প্রায়ই বলতেন—কে একজন পি সি রায় নাকি বলতেন—দেখুন স্যার, নামটা এখনও মনে আছে আমার! —তিনি নাকি বলতেন, ব্যবসায়ের মতন জিনিস নেই..."

"তারপরেই এই দেখছ চুনের ট্রাক থেকে নামছি।" —এত দুঃখেও মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, বললাম—"না, আমি একটা মুশকিলে পড়ে..."

"থাক, হয়েছে স্যার, আর বলতে হবে না; লাভ কি পাঁচ কান ক'রে?"—আমার ডান হাতটা দু হাতে চেপে ধরে একটু

আবেশভরে মুখের দিকে চেয়ে উঠে পড়ল, বলল—"পাঁচ মিনিট স্যার, এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

ত্রস্তভাবেই দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এল। আমার সুটকেশটা নীচে থেকে তুলে খালি জায়গাটায় বসিয়ে দিয়ে বলল—"কেউ যদি নামিয়ে দিতে চায় জবরদস্তি ক'রে, আপনি কক্ষনও দেবেন না স্যার—দরকার হলে পুলিস ডাকবেন। তারপরে আমি তো আছিই।"

"বাঃ! পুলিস ডাকবেন! আপনার জন্যে এক আইন আর আমার জন্যে অন্য আইন!"

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, সেইখান থেকেই ঘুরে চড় দেখিয়ে বলল—"জবরদস্তি করে, আগে ক'ষে দু ঘা বসিয়ে দেবেন বেশ ক'রে।"

"আপনি নিজে এসে বসান না দেখি কত বড় পহালমান!" —বেশ চটে দাঁড়িয়ে উঠেছে। রোগা মানুষ, কাঁপতেও আরম্ভ করেছে রাগে।

আমি ডান হাতটা ধরে বললাম—"আপনি বসুন। সত্যিই কি মারামারি করবে পুঁটলি নিয়ে?"

"করলে আমিও পেছপা নই মশাই!...আপনি কে হন ওর?"

"কেউ নয়। বোধ হয় বুঝতেই পারছেন আমি হচ্ছি বাঙালী। ওর নাম রামবুঝাওন মিশির। বলছে নাকি এক সময় আমার কাছে পড়েছিল।"

"কিরকম শিক্ষা দিয়েছেন মশাই আপনি? কিরকম শিক্ষা দেন?" —বসেনি, কথাটা পেয়ে খুব একচোট গরম হয়ে উঠেছে; বলে চলেছে—"আপনাদের শিক্ষার দোষেই ছাত্রদের এই রকম অবস্থা চারিদিকে...বাপকে মানছে না, ভাইকে মানছে না—আইন মানছে না, কানুন মানছে না। তা বেশ তো, আসুক,

চেহারা দেখে ভেবেছে, আমি কম যাই ওর থেকে। হয়ে যাক তা হলে, এই প্ল্যাটফর্মের ওপরই সবার সামনে, ওর রোয়াব আমি ভেঙে দিই...”

হাতটায় একটু টান দিয়ে বসালাম। একটু হেসেই বললাম—“আপনি ওর গুরুর চেহারা দেখে সেই আন্দাজেই বোধ হয় ওকে ঠাণ্ডা করার কথা বলছেন। কিন্তু সম্ভব কি তা? আর কাজ কি সে পরীক্ষা করে? আর আমরা পাঁচজনে দেবই বা কেন করতে? থাক ও কথা। দেখছেন লোকটা একটু খামখেয়ালী, ওর কথায় কান দিলে চলে? আর দরকারই বা কি তার?”

“দরকার নেই?” —আমার নরম হয়ে বলার জন্যে একটু জুড়িয়ে এসেছিল, আবার একটু গরম হয়ে উঠল; বলল—“দরকার নেই? কি বলছেন আপনি? অমন করে পুঁটলিটা নামিয়ে দিলে—আপনার চোখের সামনেই তো। আমি যদি এখন সুটকেশটা নামিয়ে দিই।”

“দরকার কি হ্যাঙ্গাম বাড়িয়ে? গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ একটা। আপনিও রেলযাত্রা করে যাচ্ছেন কোথায়—পথে অযথা একটা অশান্তি। তার চেয়ে এক কাজ করুন না। পোঁটলায় কি আছে আপনার?”

“কিছু না। অত প্রশ্নে কি দরকার আপনার?”

নরম গলাই, তবে শিষ্যের ওপর ঝালটা যতটা সম্ভব গুরুর ওপরে মিটিয়ে নিচ্ছে।

বললাম—“যাই থাক, আপনি সুটকেশটার ওপর তুলে রাখুন না। ...দিন, আমিই না-হয় তুলে রাখছি—”

অর্থাৎ দায়িত্বটা আমিই নিলাম। হাতটা বাড়িয়েছি, ঠেলে দিয়ে মুখটা কুঁচকে বলল—“থাক, আর দয়ায় কাজ নেই।”

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, রামবুঝাওন পুল থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। এবার একলা নয়, ওর পাশে

ওর চেয়েও লম্বা-চওড়া, মোটাসোটা একজন প্রৌঢ়, বয়স প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, পায়ে বিপুলকায় একজোড়া নাগরা জুতা, গায়ে খদ্দরের কুর্তা, গলায় তসরের চাদর জড়ানো, মাথায় বিপুল তসরের পাগড়ি হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি, পেতল দিয়ে বাঁধানো।

হন হন করে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল দুজনে। রামবুঝাওন আমায় দেখিয়ে বলল—"এই ইনি, ভভূতিবাবু, আমার মাস্টারমশাই, যাঁর কথা তোমায় বলছিলুম। ...আমার বাবুজী স্যার। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলো না, রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। বাবুজীর নাম বাবু রামসিংহাসন মিশির।"

লোকটি একরকম ভক্তিগদগদ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বলল—"নমস্তে।"

বললাম—"নমস্তে।"

রামবুঝাওন স্যুটকেশটা নামিয়ে দিয়েছে। বললাম, বসুন, জায়গাটা বাড়াবার জন্যে ওরই মধ্যে নিজেও একটু গুছিয়ে বসলাম।

পাশের লোকটির মুখের ভাবটা একটু অন্যরকম এবার। খুব বেশীরকমই আস্ফালনটা নাকি করেছিল, সেজন্যে একটু চ্যালেঞ্জের ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়েছে, তার সঙ্গে বেশ একটু ভয়ও; এবার তো দুজন। যেন প্রতীক্ষাই করছিল রামবুঝাওন এবার ওকে উঠতে বলবে, তারপর ওর প্রতিক্রিয়াটা কি হবে মনে মনে ঠাহর করছিল, আমিই সমস্যাটা মিটিয়ে দিলাম। রামবুঝাওন কিছু বলবার বা করবার আগেই বললাম—"তুমি সামনাসামনি হয়ে আমার বেঞ্চিটার ওপর বসো রামবুঝাওন, গল্প করবার সুবিধে হবে।"

কি গল্প করব, কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ আবার বাপকে এনে হাজির করল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সাধারণ সৌজন্যের প্রথা ধরে বললাম—"আপনার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, সৌভাগ্যের বিষয়।"

"সৌভাগ্য—সে আমার হুজুর, আপনাদের মতন লোকের দর্শন পাওয়া..."

"আর দেখুন স্যার, কি রকম অদ্ভুত যোগাযোগ। বাড়ি যাচ্ছি, ডেকে আনব, প্রায় বলেন তো আপনার কথা—পুল থেকে নেমে দেখি থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের সামনে কিউ-এর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছেন…জিজ্ঞেস করলুম আপনি কোথায় যাচ্ছেন? না, সোনপুরে একটা কাজে। বললুম—তা হলে চলুন, আমার মাস্টার-মশাই এই গাড়িতে যাচ্ছেন, পরিচয় করিয়ে দিই, আপনি এত করে বলতেন…" উল্টো হাতের তালি দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল—"ভাগ্য বলতে হয় তো একেই স্যার। বাবুজী হচ্ছেন ঠিকাদার। আপনার পি সি রায়ের ব্যবসাই তো ওটাও।"

ওর বাবুজী একটু গদগদ হয়ে বলল—"থাট গিলাসের টিকিট নিয়েছিলুম—বদলে সিকিন গিলাস ক'রে নিতে একটু দেরি হয়ে গেল। বললুম—তা হলে একগিলাসে গল্প করতে করতেই যাবে।"

"বড় সুখী হলাম।"

অবশ্য মোটেই হইনি। একেবারে আনাড়ি গোছের যেন লোকটা; চলতি ইংরাজী কথাগুলো বলবে, তারও ঐ নমুনা। এর সঙ্গে কি গল্প করব? একে তো নিজের চিন্তা নিয়ে মরছি। তারপর কেমন যেন মনে হচ্ছে, সমস্তটাই সাজানো—সোনপুরে কাজ থাকা থেকে থার্ড ক্লাসের টিকিট; সেটাকে সেকেণ্ড ক্লাসের করে নেওয়া; সবটুকুই। মনে হচ্ছে ও ওকে বাড়ি থেকেই টেনে এনেছে, কোন কারণে সোনপুর পর্যন্ত ভিড়িয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে। টিকিট কেটে উঁচু শ্রেণীতে বদলানো—ওটা যেন নিছক ভাঁওতা একটা। বাড়ি গিয়ে ডেকে আনতে যে সময়টা লেগেছে সেটাকে পূরণ ক'রে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে—কেন?

এদিকে কবে পড়েছিল তাও তো মনে পড়ছে না। অল্পদিনের কথাও তো নয়, কম ক'রে ধরলেও বিশ-বাইশ বছর হয়ে গেল।

*পি সি রায়ের কথা—আমি কথাটা আওড়াতাম বটে বেশী। কিন্তু ও কথাটা সব বাঙালীর মুখেই চলছে তখন।

বেশ অস্বস্তিতে পড়েছি। রাত্রির ট্রেনে যাত্রা, লেট হয়ে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। কোন জোচ্চোরে পিছু নিল না তো!

কুলি মাথার পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে বলল—"উঠুন হুজুর, গাড়ি এসে গেছে।"

হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিলাম। এক ঘণ্টার বিলম্বটা কমিয়ে তিন কোয়ার্টারে দাঁড় করিয়েছে গাড়িটা। যা দিন যাচ্ছে যেটুকু পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন পরম লাভ।

পনেরো মিনিট বাঁচিয়ে এবার দেড় ঘণ্টা। লেট করে গাড়িটা ছাড়ল।

গাড়ি পৌঁছতেই বাপ-বেটায় ভিড় ঠেলে উঠে পাশাপাশি দুটো জায়গা দখল করে বসেছিল, আমি যেতে রামবুঝাওন তার টা ছেড়ে দিয়ে আমায় বসাল। এটাও যেন উপকারের চেয়ে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়েই করল বলে মনে হলো আমার। আমার ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে আলাদা হব, পারি তো ভিড়ের অজুহাতে অন্য এক গাড়িতেই গিয়ে বসব, সেটা আর হোল না। একে তো মতলবখানা কি, সেই নিয়ে একটা ধুকপুকুনি লেগে রয়েছে, তার ওপর মাথায় ঐ পাগড়ি, গলায় আস্ত একখানা তসরের থান জড়ানো, গায়ে মোটা খদ্দরের কুর্তা, ঘামের বোটকা গন্ধে অতিষ্ঠ করে তুলেছে; ধনে-প্রাণে মারা যাওয়ার উপক্রম।

গাড়ি যতক্ষণ রইল, দাঁড়িয়েই রইল রামবুঝাওন। চুপ করে নয়, পুরনো কথা তুলে আমার গুণকীর্তন করে গেল বাপের কাছে, সে এক আলাদা যন্ত্রণা। গাড়ি ছাড়লে, আমার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তার জন্যে পুনঃ পুনঃ বাপকে বলে দিয়ে নেমে গেল।

আমি জায়গাটা পেয়েছিলাম একেবারে জানলার ধারটিতে,

গাড়ি ছেড়ে দিলে বাইরের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বসলাম। ইয়ার্ডের আলোর মালা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল আমাদের গাড়ি। স্টেশনটা শহরের শেষ প্রান্তে, অল্প একটু এসেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

"Give us more light" কিন্তু এক এক সময় মনে হয় অন্ধকারেরই যেন বেশী প্রয়োজন। বাইরের সব মুছে এলে, ভেতরে স্মৃতিতেও অনেক সময় যেন ছায়া এসে পড়ে। অন্ধকার, নিদ্রা, মৃত্যু—সবগুলো একই জাতের জিনিস—অবস্থা-ভেদে আমরা এটাকে চাই বা ওটাকে। মুছে দেবে, লুপ্ত করে দেবে। অবস্থার তারতম্যে, দুঃখ বেদনার গভীরতার অনুপাতে আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করি কোনটের প্রয়োজন, —অন্ধকার, নিদ্রা, না মৃত্যু? বেশ লাগছে। গাড়িটা হু-হু করে ছুটছে। শহরের একেবারে শেষ দিকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে কখানা বাড়ি, তাদের আলোও গেছে সরে, শুধু নক্ষত্র-খচিত আকাশের নীচে অন্ধকার আর অন্ধকার। খানিকটা পর্যন্ত গাছ, আগাছা, মাঠ, কচিৎ এক-আধটা কুটির, তারপরে চিহ্নহীন বিলুপ্তি। জামার বোতাম খুলে দিয়ে বুকটা হাওয়ায় ধরলাম মেলে। হাওয়াটা হচ্ছে সান্ত্বনা-জাতের জিনিস, তাই আলোর হাওয়ার চেয়ে অন্ধকারের হাওয়াটা যেন আরও মিষ্টি। মৃত্যুর চরম অন্ধকারের দেশে সে আবার কী নিবিড় সান্ত্বনার হাওয়া বয় কে জানে?

কিন্তু মৃত্যু আমার একেবারে শিয়রে। ও মৃত্যু নয়, তা হলে তো বাঁচতাম। সম্পূর্ণ অন্যরূপে, মাথায় পাগড়ী, গায়ে খদ্দর, গলায় দোপাট্টা।

"মাস্টার সাহেব, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?"

বললাম—"না, বেশ আছি।"

তখনই ভুলটা সংশোধন করে নিয়ে বললাম—"মাথাটা একটু একটু ধরেছে।"

বলে মাথাটা জানলার দিকে চেপে ধরলাম। যদি বকানো থেকে অব্যাহতি দেয় অন্তত।

"কোন রকম সেবায় আসতে পারি?—বলেন তো—"

মাথায় হাত বুলুনো নিশ্চয়। ওটা আলঙ্কারিক অর্থে বোধ হয় আছেই অদৃষ্টে আজ, শঙ্কিতই রয়েছি, ব্যবহারিক অর্থেও আস্বাদ গ্রহণ করবার উৎসাহ নেই আর। বললাম—"না, সেসব কিছু প্রয়োজন নেই। এই যে দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে, মাথাটা খানিকটা জানলায় এইরকম চেপে পড়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।· ·চুপচাপ করে।"

মিনিট পাঁচেও গেল না—

"ঠিক হয়ে গেছে হুজুর?"

"না, এত শিগগির কখনও যায়? এত শীগগির কোন কিছুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?"

শেষেরটুকু অবশ্য ওকেই লক্ষ্য করে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে একটু বক্রোক্তি। কিন্তু লিখে লিখে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, অত্যন্ত সাহিত্যিক হয়ে গেল, বেশ স্পষ্ট হলো না ওর কাছে।

"কতক্ষণ নেবে?"

"আপনিই জানেন।"—এই কথাটাই স্পষ্ট করে বললে ভালো হত বোধ হয়, যদিও কাজ কতটা হত জানি না, তবে অভ্যাস তো নেই, মুখে আটকে গেল। তবু চেষ্টার ত্রুটি করলাম না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো, বললাম—"তা এরকম হলে আমার প্রায় ঘণ্টা দুই লেগে যায়। গাড়িতে বোধ হয় বেশীই লাগবে।"

একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল—"কিন্তু গাড়িতে তো তেমনি হাওয়াটাও বেশী লাগছে।"

"তা লাগছে বটে। একটু যদি চুপ করে পড়ে থাকতে পারা যায় তা হলে বোধ হয় সেরেও যেতে পারে তাড়াতাড়ি।"

চুপচাপ গেল একটু। অনুভব করছি খুব যেন একটা সমস্যায় পড়েছে, আমার অশান্তির চেয়ে ওরটা কোন অংশে কম নয়।

"তা কি পারবেন চুপ করে থাকতে? কোনমতেই পারবেন না।"—একটু পরে বেশ একটু হেসে উঠেই বলল—"আপনাদের যে আবার মাস্টারি ধাত, বকছেন তো বকেই যাচ্ছেন।"

আবার উল্টে ঠাট্টা! কিন্তু একটা সুযোগও তো, ঠাট্টার উত্তরে এবার বেশ স্পষ্ট করেই প্রকাশ করা যেত মনের ভাবটা, কিন্তু এই সময় গাড়িটা ব্রেক কষতে কষতে স্টেশনে এসে প্রবেশ করল এবং রামসিংহাসন সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

প্রশ্ন করলাম—"নামছেন আপনি?"

"এই দেখুন! আপনার এই অবস্থা আর একলা ফেলে নেমে যাব আমি! এক্ষুনি আসছি।"

মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। ভাবছি গাড়িটা লেট আছে, ভগবান করেন ও এসে পড়বার আগেই যদি ছেড়ে দেয় তাড়াতাড়ি। ধরা যাক, জল খেতে নেমেছে, জলের কুসিটা খুঁজতে খুঁজতে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছে—জল খাচ্ছে, গাড়ি দিল ছেড়ে—সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ, আজ যেমন দিচ্ছে··· কিংবা যদি···

জানলার বাইরের দিকে মুখ করে আশায় আশায় নানা সম্ভাবনার ফিকরি বের করে যাচ্ছি, গাড়িটা ছেড়েও দিয়েছে, হঠাৎ-দরজার কাছে এক বিকট চীৎকার—"এই যে আসুন! অমৃতসরের জগদ্বিখ্যাত ধন্বন্তরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর···"

ঘুরে দেখি একজন হকার—চলতি গাড়িতে যারা ওষুধ ফিরি করে বেড়ায়। সামনে রামসিংহাসন। ওকে পিছু পিছু আসতে বলে এগিয়ে এল, একগাল হেসে বলল—"ভেবেছিলুম খুঁজে বের করতে দেরি হবে, কিন্তু হনুমানজীর এমন দয়া, একটু এগিয়েছি, দেখি সামনের গাড়ি থেকে নেমে আসছে—ধরে নিয়ে এলাম।"

বসে, লাঠিটার মাথায় হাত দুটো রেখে ওর দিকে চেয়ে রইল। লোকটা একটা ছোট শিশি তুলে ধরে গাড়ির আওয়াজের ওপর গলা তুলে চীৎকার করে যাচ্ছে—"বিখ্যাত দর্দ-দমন্—মাথাঘোরা, আধ-

কপালে, চোখে ধোঁয়া দেখা, অনিদ্রা—আঙুলের টিপে একটুখানি নিয়ে কপালে ঘষে দিন—দু মিনিট, ব্যস আর দেখতে নেই—সঙ্গে সঙ্গে বিলকুল সাফ।—তারপর ঘুমুন না কত ঘুমুবেন—শুধু এক টিপ, আঙুলের ডগায়—যার দরকার আছে সত্ত সত্ত পরীক্ষা করতে পারেন—দর্দ-দমন্। দর্দ-দমন্।—আসুন, হাত তুলে জানান কার দরকার—দর্দ-দমন্—ছোট শিশি তিন আনা, বড় শিশি পাঁচ আনা।..."

"হুজুরের জন্যে একটা শিশি নেব? জিনিসটা খুব ভাল, আমি নিজে পরখ করে দেখেছি।"

উল্টো দিকে মুখ করে সেই একইভাবে পড়ে আছি, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, না ঘুরেই বললাম..."না, দরকার নেই। একটু চুপ করে..."

হঠাৎ একটা খেয়াল হলো—থেমে গিয়ে সোজা হয়ে বসে হকারটাকেই প্রশ্ন করলাম—"ঘুম আসবে শীগগির?"

"সঙ্গে সঙ্গে বাবু সাহেব।"

মুখটা একটু শুকিয়েই গেছে লোকটার, সত্ত সত্ত পরীক্ষা করবার জন্যে উদ্যত, তায় ভদ্রলোকই, যারা টপ করে আমল দিতে চায় না। কথাটা বলে একটু যেন সামলে নেওয়ার জন্যেই জুড়ে দিল—"তবে আপনার যদি খুব বেশী ধরে থাকে মাথাটা তো একটু বেশী মালিশ .."

"আধ ঘণ্টা?"

"নাঃ, অত বেশী..."

"পনের মিনিট?"

"তা...তার আগেই...ঘষতে ঘষতে..."

"দাও এক শিশি।"

রামসিংহাসন দামটা দিতে যাচ্ছিল, আমি হাতটা ধরে ফেললাম, বললাম—"না না, আপনি দেবেন কেন? আপনি যে এত কষ্ট করে ডেকে এনেছেন এই যথেষ্ট।"

দাম দিয়ে শিশিটা নিয়ে মোম দিয়ে আঁটা ছিপিটা খুলে ফেললাম, দু আঙুলে একটু ঢেলে নিয়ে কপালে ঘষতে লাগলাম। আমায় কিনতে দেখে আরও কয়েকজন কিনল।

এবার স্টেশনটা কাছে, তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। অনেকগুলি শিশি বিক্রি করে হকারটা নেমে পড়ে অন্য কামরায় চলে গেল। নেমে গেল, ওরা এক কামরায় বেশীক্ষণ থাকতে সাহস করে না বলেই, তবে থেকে গেলে আর ও কিছু বিক্রি করতে পারত।

পনের মিনিটও তো নিলাম না আমি। মিনিট ছয়-সাত পরে যখন রামসিংহাসন আমায় ডাকল—বকিয়েই তো যাচ্ছে বরাবর —তখন মলম ঘষতে ঘষতে আমার হাত এলিয়ে এসেছে, মাথাটা ঢুলে পড়েছে জানলার গায়ে। দুবার ডাকার পর গাঢ় তন্দ্রার মধ্যে থেকে যেন কোন রকমে "উঃ" করে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলাম মাত্র।

পাশের কয়েকজনের মুখে বিস্মিত প্রশ্ন হলো—"ঘুমিয়ে পড়েছেন! সে কি, এরই মধ্যে! অত যিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন মাথার যন্ত্রণায়!"

"মনে তো হচ্ছে সেই রকম।"—নিতান্ত নিস্তেজ কণ্ঠস্বর রামসিংহাসনের, এমন একটা মহৌষধির সন্ধান দেওয়ার যশটা যার নাকি এত বেশী করে প্রাপ্য। একেবারে যেন চুপসে গেছে, একটু ঠেলা দিয়েই আমায় ডাকল—"মাস্টার সাহেব!"

বেশ একটু জোর দিয়েই।

এক সঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠে আপত্তি উঠল—"আহা-হা, ডাকে কখনও!...ঘুমুচ্ছেন তো ঘুমুতে দিন।...ওষুধ কিনে ফল কি তা হলে? ...আপনিই তো ডেকে নিয়ে এলেন মশাই!..."

চুপচাপ গেল এ টু, তারপর একটি যে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সেটার শব্দ দ্রুত ধাবমান গাড়িটারও শব্দের ওপর গেল উঠে। অবশ্য রামসিংহাসনেরই।

যাক, একটু ভাববার সময় পাওয়া গেল। লোকটা কে, লোক

দু'টাই বলা ঠিক। কেন এভাবে আমার পিছু নিয়েছে? জোচ্চোর বলে মনে হয়েছিল, একেবারে শেষ পরিস্থিতিতে তাতেও বেশ একটু খটকা এসে পড়েছে যেন,—অবশ্য বাঁ দিকের পকেটগুলো চেপেই আছি, তবু মনে হচ্ছে জোচ্চোর হলে, মোটঘাট পাচার করবার তালে থাকলে এই যে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম এতে তো খুশীই হওয়ার কথা ওর। কণ্ঠস্বরে তো তা মনে হয় না মোটেই। তারপর দেখলামও।

প্রগাঢ় ঘুমের নিঃশ্বাসের মধ্যে একবার খুব সন্তর্পণে বাঁ চোখের কোণটা একটু ফাঁক করে দেখলাম লাঠির পেতল-বাঁধানো মাথাটার ওপর দুটো হাত চেপে, তার ওপর চিবুকটা চেপে চুপ করে মুখ নীচু করে বসে আছে বেচারী। যেন কী মারাত্মক ভুলই একটা করে বসেছে, যার জন্যে জীবনের একটা কত বড় সুযোগ চিরদিনের জন্যে হাতছাড়া হ'য়ে গেল।

সুযোগটা হতে পারে কী? কিছু বলত আমায় যার জন্যে জমি তোয়ের করছিল? উভয়ের পক্ষেই কোনরকম ভালো প্রস্তাব? তাও তো হতে পারে...

থাক, আর বাজে ভাবনা ভাবতে পারি না। তা ভিন্ন যা ক'রে ফেলেছি, ক'রেই ফেলেছি, আর জেগে ওঠাও তো চলবে না এত তাড়াতাড়ি অত গভীর নিদ্রা থেকে। ওষুধের নিদ্রা, এত তাড়াতাড়ি ভেঙে যাওয়াও তো স্বাভাবিক নয়।

"শুনছেন মশাই?"

আমাকেই। রামসিংহাসন নয়, রামসিংহাসনকেই অন্য কে একজন ডাকছে।

"কি, বলুন না।"—উত্তর করল। স্বরটা খুব গম্ভীর।

"একবার লোকটাকে ডেকে দেবেন? আমিও এক শিশি নিতুম তা হলে।"

কোন উত্তর নেই।

"বড় একটা শিশিই নিতুম।"

"আমিও তা হলে নিতুম এক শিশি।"—আর একজন।

একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রামসিংহাসন। লাঠিসুদ্ধ হাত নেড়ে বেশ গলা ছেড়েই বলে উঠল—"তা নেবেন তো নিনগে না মশাই···—বড় নিন, ছোট নিন, মাঝারি নিন, আমার তার সঙ্গে কি সম্পর্ক? ভালো বিপদ তো। আপনারা শুধু নেবেন, আমায় ডেকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে? আমি যেন সমস্ত গাড়িটার ঘুম পাড়াবার ঠিকে নিয়েছি!"

"হঠাৎ এত চটে উঠলেন কেন? দেখলুম আপনার সঙ্গে যেন জানাশোনা—তাই···"

"জানাশোনা আমার মজঃফরপুরের অমুক অমুক বাবুর সঙ্গে আছে (বড় বড় দুজনের নাম করল), পাটনার অমুক অমুক বাবুর সঙ্গে আছে, কলকাতার অমুক অমুক শেঠের সঙ্গে আছে, বলতে চান সবাইকে ডেকে একাট্ঠা করব আপনাদের জন্যে?"

ভয়ানক চটেছে, ঝাউ ঝাউ করে শব্দ উঠছে গাড়ির আওয়াজের ওপর।

"ওর মানে এই হলো?"

"আর কি হতে পারে আপনিই বলুন। আপনার দরকার থাকে আপনি নেমে গিয়ে ডেকে আনুন। আমার সম্বন্ধী না ভায়রা-ভাই ও শালা যে, আমি তোয়াজ করে ডেকে না নিয়ে এলে আসবে না। আর যদি বলেন তো আমি নামলে তো ওকে পুলিসের হাতেই দেব আগে।"

"ওর অপরাধটা কি, হ্যাঁ মশাই?"—বেশ ব্যঙ্গের টোনে প্রশ্ন বোধ হয় দ্বিতীয় লোকটার, যে বলেছিল সেও এক শিশি নিতে চায়।

"অপরাধ!—জোচ্চোর—খুনে। কি বিষ দিল শুধু বলে, ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ঢুলে নেতিয়ে পড়লেন। কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় গিয়ে উঠবেন কিছু ঠিক নেই। গোখরো সাপের বিষও এত তাড়াতাড়ি

কাজ করে না। মোটে আর উঠবেন কিনা তারই বা ঠিক কি? আপনি বলছেন—অপরাধটা কি! তাজ্জব ব্যাপার আপনাদের!"

ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছে একেবারে।

হাসি পাচ্ছে ভয়ানক, এত দুঃখের মধ্যেও; হাসি জিনিসটা বাধা পেলেই আরও অবাধ্য হয়ে ওঠে তো। ভয় হচ্ছে চালটা ফাঁস না হয়ে যায় আমার; লজ্জাও তো একটা।

না হয় এই চেঁচামেচির অজুহাতেই পড়ি উঠে?

একটি ভদ্রলোক থামিয়ে দিলেন ওদের। বললেন—"আপনারা একটু চুপ করলে ভালো হয়। আমার মনে হয় ওষুধটা যেমন বিষও নয় তেমনি যতটা গুণের মনে করছেন ততটাও নয় আবার। ভদ্রলোক এমান খুব ক্লান্ত ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল আমার যেন। এসব ওষুধ তো আর কিছুই নয়—পিপারমেণ্ট, মেন্থল এই সব দিয়ে তৈরী—একটা ঠাণ্ডার ভাব সন্ত সন্ত এনে দেয়—তারপর গাড়ির হাওয়াটা রয়েছে—ঘুমিয়ে পড়েছেন—"

"আর কোথায় নামবার, যদি ঠেলে গিয়ে আর এক স্টেশনে ওঠেন,—তখন?"—রামসিংহাসনেরই প্রশ্ন, তবে অনেকটা খাদে নেমে এসেছে, যদিও ব্যঙ্গের রেশ একটু লেগেই রয়েছে।

"মনে হয় সে রকম ভয় নেই কিছু।"—অন্য একজন বলছেন বলে মনে হচ্ছে—"বাঙালী মানুষ, এসব স্টেশনে না নামাই সম্ভব। নামতে হাজীপুর, সোনপুর কিংবা হয়তো পাটনাতেই যাবেন। আমিও পাটনায় যাচ্ছি, হাজীপুরেই না হয় একবার তুলে জিগ্যেস করে নিলেই হবে।"

"যদি উত্তর পান।"—সেই একটু ব্যঙ্গের রেশ।

"না, না, তেমন কিছু নয়। আপনি আবার বাড়াবাড়ি ভয় পেয়ে গেছেন।"—একটু লঘুভাবেই হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, বললেন—"কি সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে ওঁর?"

"সম্বন্ধ আর কি থাকবে। উনি দেখছেন বাঙালী, আপনাদের

সঙ্গেও যেমন আমার সঙ্গেও তেমনি। তবে এক সঙ্গে যাচ্ছি গল্প করতে করতে…"

"যাবেন কোথায় আপনারা ?"

"আমি যাব সোনপুর পর্যন্ত।"

"আর উনি ?"

"পাটনা।"

মুখ ফসকেই বেরিয়ে পড়েছে কথাটা ; সামলে নিয়ে বলল—"বোধ হয়। ঐ রকম যেন একবার বললেন।"

"তা হলে ঐ। একটু ঘুমুতে দিন। সত্যিই যেন বিশেষ ক্লান্ত রয়েছেন।"

সত্যই বিশেষ ক্লান্ত, সমস্ত দিনের হিসেবটা তো রয়েছেই তোমার কাছে ; ভান করতে করতে কখন্ সত্যিকার ঘুমই এসে গেছে, গাঢ় ঘুমই, ওঠানামার হৈচৈয়ে হঠাৎ গেল ভেঙে। গাড়িটা ভগবানপুর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশে কিন্তু আমার রামসিংহাসন নেই। তার জায়গায় অন্য একজন রয়েছেন বসে। সামনের ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—"আর উনি—নেমে গেলেন এখানে ?"

"উনি তো অনেক আগেই নেমে গেলেন দেখলুম…কুড়হানি স্টেশনেই। অথচ বললেন সোনপুরে যাবেন।"

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। অথচ একটা প্রবল কুণ্ঠাও রয়েছে, তবু তার মধ্যেই যতটা পারা গেল সন্তর্পণে, একটু আড়মোড়া ভাঙবার ছুতা করে ওপরটা দেখে নিলাম। না, মোটঘাটগুলা ঠিকই আছে।

কিন্তু গেল কোথায় লোকটা।

শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাওয়ায় মনটাও অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। অনেক কিছুই তো নির্ভর করে মনের অবস্থার ওপর, সেই সন্দিগ্ধ ভাবটা—শুধুই একটা অবিশ্বাস, একটা আশঙ্কা, শুধু মন্দ দিকটাই ধরে থাকা—সেটা গেছে কেটে। একটা অনুতাপের ভাবও

মনটাকে ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছে। বিরূপতাই ক'রে এসেছি—হয়তো সত্যিই কোন ভাল কথাই বলবার ছিল বেচারীর—দুজনের পক্ষেই ভালো—না হয়, শুধু ওর প্রয়োজন হলেও ঠিক এমনভাবে অবহেলা আর বিরক্তির ভাবটার পোষণ করা ঠিক হয়নি আমার।

একটা অনুকম্পাও আসছে; গাব্দাগোব্দা হাঁদা-হাঁদা চেহারাটা—আহা!—আর ভালোই তো ক'রে এল বরাবর...

"আরে, ঐ তো রয়েছেন উনি। ঐ যে, উনিই না?"

—বক্তার তর্জনী অনুসরণ ক'রে দেখি রামসিংহাসনই, মাথায় সেই পাগড়ি, গলায় সেই আস্ত গরদের থান, হাতে সেই পিতল-বাঁধানো লাঠি। চেহারাটাও দেখলাম। খানিকটা দূরে একটা লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, এই সময় গাড়িটা ছেড়ে যেতে, ঘুরে একবার আমাদের কামরাটার দিকে চাইল, আমি জেগে আছি দেখে একটু যেন থমকেও পড়ল, তারপর পা চালিয়ে সামনের থার্ড ক্লাসটাতে উঠে পড়ল।

ভদ্রলোক একটু মুখ টিপে হেসে আমায় প্রশ্ন করলেন—"বুঝলেন ব্যাপারটা?"

"না তো।"—উত্তর করলাম।

"থার্ডের টিকিট, ইণ্টারে এসে বসেছিল। পাশের কামরায় টিকিট চেকারকে উঠতে দেখলো তো তখন ··গাড়ি এসে থামতেই নেমে গেল। এই তো চলছে নিত্যি এদিকে।"

"কিংবা হয়ত "ডব্লু-টি" (W. T. অর্থাৎ টিকিট-রহিত)—একজন মন্তব্য করলেন। —একটু হাসির সঙ্গে ঐ আলোচনাই চলল অতঃপর। টিকিট-বিহীন যাত্রীর বাড়াবাড়ির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের চেকিঙের (magisterial checking) বিশেষ ব্যবস্থা। তার নিগ্রহ—তাতেও ফাঁকি দেওয়ার বিশেষ বিশেষ কৌশল। এই আলোচনার মধ্যেই গাড়িটা এসে পরের স্টেশন সরাই-এ পৌঁছাল

এবং—যেন পাদানিতে দাঁড়িয়েই এসেছে এতক্ষণ, ভালো ক'রে থামতে না থামতেই হন হন ক'রে নেমে এসে আমাদের গাড়ির দোরটা খুলে উঠে পড়ল রামসিংহাসন। তারপর এগিয়ে এসেই আমার সামনের বেঞ্চের একেবারে ও-কোণের একজনকে প্রশ্ন—একটু যেন একান্তেই—"চিকিন্ হো গইল বা ?"—অর্থাৎ টিকেট চেকিং হয়ে গেছে ?

এদিককার চারখানা বেঞ্চ জুড়ে হো-হো করে একটা হাসি উঠল। ঐ আলোচনাই তো চলছিল, বিশেষ করে ওকে কেন্দ্র করেই।

"হাসিটা কিসের !"—সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত কামরাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল রামসিংহাসন, অপ্রতিভ হয়েই পড়েছে, তবে বিশেষ তেমন কিছু নয়।

"আপনি বুঝি সেই ভয়েই নেমে গিয়ে ছিলেন ?"—একজন প্রশ্ন করলেন।

"ভয়। কেন, টিকিট নেই আমার মনে করছেন ?"

কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়েই ছিল, একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বের ক'রে তুলে ধরল, প্রশ্ন করল—"এটা কি টিকিট নয় ?"

"ও টিকিট নিয়ে এ-ক্লাসে বসলে কি ভয়ের কিছু নেই মনে করেন ?"

অত ভারী শরীর অথচ এক দিক দিয়ে এরকম নিরীহ প্রকৃতি, অনেকটা যেন বোকাই—ঐ ধরনের লোক পেলে ঠাট্টার প্রবৃত্তিটা বেড়েই যায় মানুষের। হাসিই চলছিল, একজন প্রশ্ন করল—"তবে আপনি নেমে গেলেন কেন অমন ক'রে ?"

"এসেই জিগ্যেসই বা করলেন কেন—চেকিং হয়ে গেছে কিনা ?"

—নকল করার একটা ঝোঁক এসে গেছে, হাসিটা গড়িয়েই চলেছে।

"বাঃ, বাঃ, হাসির মাথামুণ্ডু নেই, হাসি! কাজ ছিল; ঐ হুকারটাও তো এসেছিল; কৈ তখন তো হাসি ছিল না কারুর মুখে।"

"ও!"—এমনভাবে বলল ভদ্রলোক, তাইতে হকারের সঙ্গে সাদৃশ্য এত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবার একটা ঘর-ফাটানো হাসি উঠল।

"হাসুন যত পারেন হেসে নিন।"—বলে রামসিংহাসন এগিয়ে এল আমার দিকে। বলল—"নমস্তে, ঘুমটা হলো আপনার ভালোরকম? তাহলে আমাদের কাজের কথাটা হয়ে যেত।"

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে; উল্ট দিক থেকে নাকি একটা গাড়ি আসছে। কাজের কথাটা হচ্ছে কি? কিন্তু রামসিংহাসন এমনভাবে বলল—যেন অনেক আগে আরম্ভই হয়ে গিয়েছিল কথা, মাঝখানে আবার বিরতি ছিল, আমার ঘুমের জন্যেই নিশ্চয়।···কেমন একটা মায়া এসে গেছে লোকটার ওপর। জোচ্চোর বলেই মনে হচ্ছে যেন, কিন্তু হয়ই যদি তো উগ্ররকমের কিছু নয় নিশ্চয়, এই যেমন থার্ডের টিকিট করে সেকেণ্ডে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকা—এই ধরনেরই। তা ভিন্ন যতই গায়ে না মাখুক, সবার বিদ্রূপের মধ্যে একা পড়ে গিয়ে খানিকটা বিপর্যস্ত তো হয়েই পড়েছে, আমি আর ওটা বাড়তে দিলাম না, বললাম—"ঠিক, শেষ করেই ফেলি আসুন। হ্যাঁ ঘুমিয়েছি মন্দ নয়। এই যে এইখানেই বসুন আপনি।"

পাশের লোকটিকে বললাম—"আপনি দয়া করে একটু সরে যাবেন?"

সাফল্য যে এত সুলভ হবে, নিশ্চয় আশা করতে পারেনি রামসিংহাসন। একটু যেন সন্দিগ্ধভাবে চাইল আমার মুখের পানে, তারপর আমার পাশে বসে পড়ে বলল—"আমার ছেলে নিশ্চয় আপনাকে বলেছে—আমাদের একটা চুনের কারবার আছে।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কতকটা। রামবুঝাওনটা তাহলে করেইনি বিশ্বাস যে, চুনের ট্রাকটা আমার নয়। একে বিশ্বাস করানো যে আরও শক্ত, একেবারে অসম্ভবই হবে সেটা অনুভব করে ইতিকর্তব্যের কথা ভাবছি, রামসিংহাসন মুখের দিকে মুখটা বেশ ভালভাবে ঘুরিয়ে একটু ঘুরেও বসে বলল—"বাইরে থেকে আমদানি

করে শহরে সাপ্লাই দিই। সবরকম পার্টি আছে—গুরমিণ্ট, পরাপিট্
(গভর্নমেণ্ট, প্রাইভেট)।"

এখনও উত্তর ঠিক ক'রে উঠতে না পেরে অনির্দিষ্টভাবে বললাম—"ও।"

"বড় বড় চুনের কারবারির সঙ্গে আমার লেনদেন—যারা ভোয়ের করে, যেমন ধরুন…"

কয়েকটা নাম করে গেল।

সংক্ষিপ্তভাবেই বললাম—"তাই নাকি?"

"বহুত পুরনো কারবার আমার। শুরু করেছি পি-স্কি রায়ের হুকুমে…"

"পি-স্কি রায়টা কে?"

"সেই যে আমার ছেলে যখন আপনার কাছে পড়ত…"

"ও বুঝেছি।"

—অর্থাৎ আচার্য পি সি রায়। ছেলেটা এতদূর পর্যন্ত তালিম দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে পিছনে।"

"হুজুরের ফাক্টার কোথায়? না, শুধু কিনে এনে ইস্টাক (স্টক) করেন?"

মঝঃফরপুর আর মাতিহারি জেলায় বুড়ি গণ্ডকীতে 'কঙ্কড়' বলে একরকম পাথরের মত বস্তু পাওয়া যায়, তা থেকে চুন হোত জানতাম। ঝিনুকেরও চুন হোত, দৈবযোগে দু'একটা জায়গার নাম শোনা ছিল। পিছুবার উপায় নেই, এগিয়েই গেলাম; বললাম—"না কিনে আনি না; নিজেরই ফ্যাক্টরি আছে।"

একটা জায়গার নাম করে দিলাম।

একেবারে ঘুরে বসে ডানহাতটা দু'হাতে ধরে ফেলল।

"আমি জানি হুজুর আপনি ছোটখাটো ব্যবসা করবার লোক নন—রামবুঝাওন তাই বলছিল—পিস্কি…মানে, অতবড় একজন মানুষের সাকরেদ আপনি, খুচর-কারবারের লোক যে নয়, আগেই বুঝে

নিয়েছি। বলেইছি হুজুর, আমি মোটা নফা ছেড়ে দিই ফ্যাক্টরির জন্যে; আমার নিজের কিছু বাঁচুক আর নাই বাঁচুক। তার ওপর আপনি আমার ছেলের গুরু, মোটা নফা থাকবে আপনার। কি রেট হুজুর আপনার টন্ পিছু?"

"কি রেটে নেন আপনি?"

আমি বেশ খানিকটা কমিয়েই বললাম, ওর অনেক সুবিধে করে দিয়ে। কে আবার অত দরকষাকষির মধ্যে যায়? তা ভিন্ন ও কথাটাও তো রয়েছে। গেরস্থ গয়লানীর দুধের দাম কাটতে কাটতে একেবারে শেষ করে আনার পরও গয়লানী নাকি বলেছিল—"এখনও দুধে হাত পড়েনি।" তার ছিল জলের ব্যবসা আমার তো তাও নয়, নিতান্তই হাওয়ার; নিক না কত লাভ নেবে।

হাতটা চেপেই রয়েছে, মুখের ওপর আকুল দৃষ্টি ফেলে রেখে। হঠাৎ একটা হাত সরিয়ে নিজের বুক পকেটে সাঁদ করিয়ে দিল—

"তা হলে হুজুর সামান্য আগাম নিয়ে রাখুন।"

সর্বনাশ! রসিকতা এতদূর এগুবে কে জানত? আমি সভয়ে বলে উঠলাম—"না, না, কোথায় কি ঠিক নেই—আগাম ওরকম নিই না আমি। আমি ফিরে আসি—কথাবার্তা আরও পাকা হোক, তারপর…"

প্রবল আপত্তির সঙ্গে হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করেছি, একটি একশ টাকার নোট টেনে বের করল—

"না, শুনব না—সগুন (শুভ বৌনি) হিসাবে নিতেই হবে—আপনার শিষ্য রামবুঝাওনের প্রণামী হিসাবে…"

কি বলচ?—হাতিয়ে নিয়ে রসিকতাটুকু একটা final বা চরম পরিণতিতে এনে ফেললেই ভালো হোত? তারপর না হয় বাড়ি গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যেত টাকাটা—সব কথা জানিয়ে—কি ক'রে বাধ্য হয়ে চুনের কারখানার মালিক হয়ে পড়তে হয়েছিল।—কি বলো—এই তো?

আমি বলি, তার ওপরে গেলেও অন্যায় হতো না, অর্থাৎ টাকাটা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করলেও। কেন, তা বলছি—

টাকা নিয়ে ঐ রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে, এমন সময় নাট্যমঞ্চে আর একজনের প্রবেশ। গাড়িতে উঠে ঐদিকেই বসতে যাচ্ছিলেন, এদিকে চোখ পড়তে হন হন ক'রে এগিয়ে এলেন—

"আরে, রামসিংহাসনবাবু না!"

ঘুরে দেখেই মুখটা শুকিয়ে গেল রামসিংহাসনের, সামলে নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলল—"হ্যাঁ, এই যে, নমস্তে…"

ঠিক এই সময় গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল এবং রামসিংহাসন ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, আমায়ই বলল—"তাহলে আমি আসছি—হাজীপুরে আবার…"

"চললেন যে! বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে।"—নবাগত যেন একটু পথ আটকাবারই ভাব করে বললেন। রামসিংহাসনও একটু যেন জোর করেই বেরিয়ে গেল, আমায় দেখিয়ে বলল—"ঐ যে, ওঁর সঙ্গে কাজ শেষ হয়নি—আসছি আবার পরের স্টেশনে।"

তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

ভদ্রলোক আমার পাশের জায়গাটাতে বসলেন। ওঁর কাছেই সব শুনলাম—

রামসিংহাসনের ঐ পদ্ধতি। কাজ শুরু করবার সময় খুব খাতির, খুব উদার। মাস চার পাঁচ বিলের সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে টাকা। ঐ করে একটা বিশ্বাস জমিয়ে নেবে। তার জোরে টাকা কমিয়ে এনে কয়েক মাস, তারপর টাকা বন্ধ করে আরও ক'মাস চালিয়ে নেবে। তারপরে আর টিকি দেখা যাবে না। বাইরের কাজ করত। জামসেদপুর, তারপর ডালটনগঞ্জ, তারপর বালিয়া—এই তিনটে জায়গা শেষ করে কয়েক বছর মঝঃফরপুরে এসে বসেছে।

এ ভদ্রলোকের প্রায় হাজার দুই টাকা পড়ে গেছে—যেমন

বললেন। মজঃফরপুর-ছাপরা-মোতিহারীর প্রায় সব নামই তো 'রাম' দিয়ে, সেকালে আরও বেশি ছিল—রামখেলাওন, রামবৃছ (অর্থাৎ বৃক্ষ), রাম-সরোবর—তাদের ভিড়ে গুলিয়ে ফেলছিলাম, পদ্ধতিটা জেনে এবার মনে পড়ছে। হ্যাঁ, রামবুঝাওনই, ঐ করে বিশ্বাস কায়েম করে নিয়ে—গরীব গৃহশিক্ষক, কত আর মারবে? তবু ক'মাসে প্রায় একশ'-সোওয়াশ' টাকার ঘা দিয়েছিল। আরও মনে পড়ছে—আমাদের মেসের রঞ্জনবাবু ছিলেন রসিক মানুষ—একটা কথাই দিনকতক চালিয়ে দিয়েছিলেন—"রামবুঝাওন একেবারে রাম বোঝানো বুঝিয়ে দিয়েছে বিভূতিবাবুকে।" মনে পড়েছে।

তাই বলছিলাম তোমায়। অবশ্য এতদিনের পুরানো পাওনা ওভাবে শুধিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না, তবুও নিলে হয়তো যিনি এভাবে পুষিয়ে দেওয়ার যোগাড় করে দিয়েছিলেন অন্তত তাঁর কাছে অপরাধী হতাম না।

দাঁড়াও আরও আছে।

গাড়ি বেশ জোরে ছেড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক (সাজগোছ একটু ভদ্রগোছেরই) আমার গায়ে একটু ঘেঁষে ডাকলেন—

"এ হুজুর!"

"বলুন"—উত্তর করলাম।

"উনি ফিরে আসবেন মনে করেন?"

"আপনি মনে করেন?"

কি ভাবতে লাগলেন চুপ করে। তারপর আবার—

"এ হুজুর।"

"বলুন।"

"এলে আপনি দয়া করে ঐ টাকাটা নিয়ে নেবেন। না, আপনাকে নিতেই বলছি না, নিয়ে আমায় দিয়ে দেবেন।"

"কি ক'রে হয় তা?"

"আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নোব। আজ সাত মাস একটা পয়সা ঠেকান নি।"

চুপ করেই আছি।

"আর, শুনুন।"

"বলুন।"

"সঙ্গে সঙ্গে ও টাকাটা আবার আমি আপনাকে দিয়ে দোব। ...হ্যাঁ, ওর হাতে যাবেন না, ভীষণ বেইমান, আপনি আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন, ঐ টাকা আগাম ক'রে।" —ওরই মত দু'হাতে ডান হাতটা চেপে ধরেছেন।

পেট ফুলে মরছি ভেতরে ভেতরে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিতেই হবে। আমার ফারম্ হলো—'বাবুলাল শিউসরণ'—একটা সুরকির কলও আছে। নিশ্চয় নাম শুনেছেন?"

কেন জানি না, প্রশ্নটা ক'রে বেশ একটু যেন উদ্বেগের সঙ্গেই আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আজকের দিনটা তো মিথ্যাকেই উৎসর্গ করা, বললাম—"খুব, খুব শুনেছি। আপনিই তাহলে...."

খপ করে একটু সরে এসে চাপা গলায় বললেন—"যদি কিছু অন্যরকম শুনে থাকেন, একেবারে কান দেবেন না—একেবারে নয়—অনেক শত্রু আছে তো বাজারে—ভালো দেখতে পারে না—আমার কাছে আপনার একটি পয়সা ডুববে না...এ হুজুর!"

আর চাপতে পারা গেল না—সমস্ত দুনিয়াটায় কি তাহলে এইরকম জোঁকের ওপর জোঁক বসে রয়েছে? —ইনি যে আবার ওর ওপরেই যান! বাজারে এত বদনাম যে তা নিয়ে আগে থাকতেই সাবধান হয়ে যাচ্ছেন। —হো হো ক'রে হেসে উঠেছি, ওঁর হাতটা আলগা হয়ে গেল। অন্য কয়েকজনও প্রশ্ন করে উঠলেন—"কি হলো বাঙ্গালীবাবু? ...হঠাৎ ওরকম ক'রে হেসে উঠলেন যে?"

জোঁক নিয়েই হাসি আমার, তবে সেটা তো বলা যায় না। আসল কথাটাই এনে ফেললাম, এরকম করে সারাপথ তো চালানও

যায় না। ওঁরই সম্ভাষণ ওঁকে ফিরিয়ে দিয়ে হাতজোড় ক'রে বললাম—"এ হুজুর, মাফ করবেন, আমি হচ্ছি রাজ্যবিহীন রাজা, আমার কাছে কিছু আশা নেই।"

"তার মানে!" —বেশ বিস্মিত হয়ে চাইলেন। আরও কয়েকজন ঐ প্রশ্নটাই করলেন, হাসিটা হঠাৎ কৌতূহল উদ্রেক করেছে তো সবার।

"আমার চুনের ফাক্টারি, কি নুনের আড়ত—কোন কারবারই নেই।"

"তা হলে। বাবু রামসিংহাসনকে যে বললেন?"

"কি করব?—পথ চলা দায় করে তুলেছিলেন যে। তাও বলেছি প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকবার পরও রেহাই না পেয়ে। ...ওঁদের জিগ্যেস করুন না।"

চোখ বড় বড় ক'রে শুনছিলেন সবাই, এক সঙ্গে ফুকরে হেসে উঠলেন। অবশ্য আমার নূতন খদ্দের বাদে, তিনি যে একটু চুপসেই যাবেন এটা তো বলাই বাহুল্য।

রামসিংহাসনও যে আর উঠলেন না, একথা বলাও বাহুল্যই।

হাজীপুরটা হচ্ছে বেহারের চন্দননগর, এখানে কলার কারবার। না, আমার মত 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের' নয়, সত্যিকার কলাই; চন্দননগরে চাঁপা, এখানে কাঁটালি। অবশ্য "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" যে একেবারে অনুপস্থিত তাই বা কেমন ক'রে বলি? মিনিট তিন থেকে মিনিট পাঁচেক থামবার কথা টাইম্ টেবিলে—এর মধ্যেই কারবার শেষ প্ল্যাটফরম আর গাড়ির মাঝখানে। কত খদ্দের ব্যাপারীকে দেখাচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কত ব্যাপারী খদ্দেরকে।

সদ্য সদ্য একটা নমুনা তো পাওয়াই গেল। হ্যাঁ, আমাদের কামরাতেই। আর, বেচারী শিউসরণবাবুর ওপর দিয়েই। বেচারীর গ্রহবৈগুণ্যটা ছাখো একবার!

ভদ্রলোক বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন। ওটা চাপা

দেওয়ার জন্যেই হোক, বা সত্যিকার শখ কিংবা প্রয়োজনেই হোক, ডজন দশেক কলা কিনলেন। ব্যবসায়ীর মাল কেনা, বেশ হিসেব করেই কিনলেন—টানাটানি করে দরদস্তুর ঠিক করে মাল গুনে-গেঁথে দাম হয়েছে তিন টাকা কয়েক আনা। সব হিসেবই ঠিক রইল, শুধু আসলটাই বাদ। ট্রেন বিশ্রীরকম লেট্; পাঁচ মিনিটের তিন মিনিটও বোধহয় দাঁড়াল না। নোটটি হস্তান্তর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ দিয়ে দিল।

"আর চেঞ্জ! চেঞ্জ! আমার চেঞ্জ ফেরত দে।"

—আর চেঞ্জ ফেরত! ওরা এসব তাক্ বোঝে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল, একটিবারও তাগাদা করেনি টাকার জন্যে, এখন চেঞ্জ ফেরতের তাগাদায় কান দিতে বয়ে গেছে। দেখলুম খুব মাথা ঝুঁকিয়ে পয়সা গোনার ভান করল একটু, তারপর দলে ভিড়ে গেল। আবার চেন টানার ভয়ও তো রয়েছে।

সবাই চাপবারই চেষ্টা করল হাসিটা। শিউসরণ অপ্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তার ওপর এই লোকসান, সহানুভূতিই তো আসে। কিন্তু কী যে একটা হাসির বদ হাওয়া জমাট হয়ে রয়েছে গাড়িটাতে, আর কোথায় যে একটা সুড়সুড়ি দেয় এ ধরনের বোকাদণ্ড, বুঝেছি অসম্ভব হয়ে পড়ছে সবার হাসি চেপে রাখা। একটু "খুক্ খুক্" এখানে ওখানে, তারপর যেন চেপে রাখবার চেষ্টা করবার জন্যেই একবারে তোড়ে বেরিয়ে পড়ল হাসিটা। এবার একেবারে ছাত-ফাটানো।

—সেই জোঁকের ওপর জোঁক বসা তো।

শিউসরণ একটু লজ্জিত হাসি হেসে মগ্নকণ্ঠে বললেন—"যানে দিজিয়ে শালে কো। নোট ভি ওয়েসেহি থা।"

নোটটা হয়তো ছেঁড়া বা তেলচিটে, তাই যতটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

হাসিতে বিদ্রূপে কেমন মুখ আলগা হয়ে গেলে সবার। একজন ছোট্ট টিপ্পনী করল—"কিন্তু আসল ছিল তো বাবুসায়েব?"

—আবার একটা তুমুল হাসি।

গুম্ গুম্ গুম্ করে একটা শব্দ উঠল, মুখ বাড়িয়ে দেখি আমরা হাজীপুরের পুলের ওপর এসে গেছি; ইঞ্জিন আর ক'টা গাড়ি উঠেই গেছে ওপরে। গতিবেগও কমে গেছে গাড়িটার।

পুলটা হচ্ছে গণ্ডকীর ওপর। ভুল করো না যেন, এ গণ্ডকী সমস্তিপুরের গণ্ডকী নয়, তার নামটাও হচ্ছে বুড়ীগণ্ডকী। এই হলো আসল গণ্ডকী, উত্তর বেহারের তিনটি যে বড় বড় নদী তার অন্যতম। আর দুটি হলো একদিকে কুশী, যেটা দ্বারভাঙ্গা সহর্ষা আর পূর্ণিয়া জেলা হয়ে গেছে, অন্যদিকে সরযূ, যেটা উত্তর প্রদেশ হয়ে নেমে এসে শেষের দিকে ছাপরা জেলা হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। গণ্ডকী হলো মাঝখানে, মোতিহারী, ছাপরা আর মজঃফরপুর জেলা হয়ে পাটনার সামনে এসে গঙ্গায় পড়েছে। তিনটেই হলো গঙ্গার উপনদী। তিনটেই খুব বড় নদী, বাংলার ভাগীরথী রূপনারায়ণের অনুরূপ।

গণ্ডকীর আরও দুটি নাম আছে; নারায়ণী আর শালগ্রামী এবং এ দুটি নামের তাৎপর্যও আছে। এই নদীটি যেখানে হিমালয় থেকে বেরিয়েছে সেটা শালগ্রাম বা নারায়ণ-শিলার জায়গা। ডিম্বাকৃতি এই সুমসৃণ শিলাকেই আমরা নারায়ণরূপে পূজা করি, জানো। যিনি অসীম, অনন্ত, তিনি এই সান্ত, শুদ্ধ আধারে অধিষ্ঠান ক'রে আমার পূজা গ্রহণ করুন; হিন্দুর প্রতীক বা আধার পূজার যা পদ্ধতি। প্রমেয় আর অপ্রমেয়র মধ্যে যোগসাধনের পন্থাও আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে হিন্দু; মনটা অনন্তে লীন ক'রে দেওয়া একেবারে, কোন আধার ব্যতিরেকেই, অর্থাৎ নিরাধারকে নিরাধাররূপেই পাওয়ার চেষ্টা; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ, যাকে স্থুল জীবনধারণের নানা সমস্যা মিটাতেই দিনের প্রায় সমস্তটুকু সময় দিতে হবে, সাধারণভাবে তার সেই পন্থা হতে পারে না, সেটা নাকি হলো যাঁরা নিতান্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাঁদের জন্যেই। তাই এই শালগ্রাম, এই

শিবলিঙ্গ, এক হিসাবে কোন আকারই নেই; কিংবা কল্পনাটাকে আরও খানিকটা মূর্ত করে নিয়ে মূর্তিপূজা—লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিবদুর্গা; তোমার মনের বৃত্তি বা অভিরুচি মতো। এই পথেও আবার সাধক মূর্ত থেকে অমূর্তে চলে যাচ্ছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ আর পুরাণতক ধর্ম, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কত বিচিত্র উপলব্ধির সমাবেশ যে এরমধ্যে। হিন্দু ধর্মটাকে আরণ্যক ধর্মও বলা হয়। "বুনো" অর্থে নয়, ব্রহ্মচিন্তা নিয়েই যাঁরা দিনাতিপাত করতেন সেই অরণ্যবাসী মুনি-ঋষিদের চিন্তাপ্রসূত বলেই। তবে আমার মনে হয় অন্য এক অর্থেও একে আরণ্যক ধর্ম বেশ বলা চলে। এত চিন্তার বৈচিত্র্য, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত সাধন-পদ্ধতির বিভিন্নতা—বহুক্ষেত্রে মনে হয় যেন পরস্পর বিরোধীই যে, এও যেন এক পাহাড়, পর্বত-গুহা-কন্দর-নদী—হ্রদ-তড়াগ-পাদপ-গুল্ম দিয়ে রচা অতি বিচিত্র অরণ্যই। তোমার যেখানে অভিরুচি মনের আশ্রয় রচনা করে সাধনে ব'সে যেতে পার। হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষও এইখানেই, যদি বিপদ বা অপকর্ষই বলো তো তাও। অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে (ধর্ম-চিন্তার রাজ্যেই বলি) সমতা নেই। তবে সেটা আপাতদৃষ্টিতেই। একটু ভেবে দেখলে কি বোঝা যায় না যে একখানি বই বা একটি মতবাদকে আশ্রয় করে যে ধর্ম, তা কি নানা মনোবৃত্তিকে একত্র ক'রে এক ধরনের আপসই? আমার মনে হয় এই আপস চিরসঞ্চরণশীল চিরপ্রগতিশীল মানব মনের পক্ষে বেশ স্বাভাবিক নয়। তাই এই রকম বহু ধর্মেই—বহু বলি কেন, হাজার আড়াই-তিনের মধ্যে রচিত সব ধর্মেই চিন্তার বৈচিত্র্য ঢুকে পড়ছে; আমার এই নতুন অর্থে "আরণ্যক" হয়ে পড়বার লক্ষণ দিয়েছে দেখা। আমার তো নিজের মনে হয় একটা খুব সুস্থ লক্ষণই। চিন্তার স্বাধীনতা (অবশ্য একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই) চিন্তার এই প্রসার, এই ক্রমে ঔদার্য এনে দেবে। ধর্মের নামে হানাহানি, যেটা নাকি "বুনো" অর্থে আরণ্যক যুগেরই একটা বর্বর উত্তরাধিকার

মানুষের, তা যাবে লুপ্ত হয়ে। যা ছিল (বা এখনও হয়ে রয়েছে) মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। যার জন্যে—যেন এই বর্বরতায় ক্লান্ত হয়েই এক অংশের চিন্তানায়কেরা আজ বলছেন—ধর্মের পাটই উঠিয়ে দিয়ে দেখা যাক না ফলটা কি রকম দাঁড়ায়। মতে না মিলুক, খুব দোষও দিই না তাঁদের।

পুলের মাঝামাঝি উঠে এসেছি আমরা। আমার ডাইনে নারায়ণী একেবারে সেই দিক-রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঁয়ে যেখানে গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে, এখান থেকে বোধ হয় মাইল চারেক দূরে, সে পর্যন্ত দেখা যায়, তারপরে একটা অস্পষ্টতা, তারপরে আরও কত দূরে পাটনা শহরের দীপাবলী—আট দশ মাইলের একটা রেখা, দূরত্বের জন্য মাইলখানেকের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। অন্ধকারের গায়ে চিকচিক করছে আলোর টিপগুলো। আর এই বিরাট বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ নদী-তীর-নগরী; দূর-আসন্ন—সমস্তটুকুর ওপর অনুপচিত কোজাগর চন্দ্রের জ্যোৎস্না; কী করে তোমায় বোঝাই সে কী জিনিস!

শুধু তো তাই নয়। আমি এখন ভারতের অন্যতম এক মহাতীর্থে। সামনে সোনপুরের তীরে ঐ হরিহর-ক্ষেত্র। কবে তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তার জন্যে আমায় পুরাণেতিহাসের পাতা ওলটাতে বলো না। ওটা বিশ্বাসে গ্রহণ করে নিতে দাও, ওই দূরে তাঁদের মন্দির, তীরলগ্ন একটি শ্বেত-বিন্দু। আলিঙ্গনবদ্ধ এই দুই দেবতাকে আমার প্রণাম পাঠিয়ে দিলাম কোন্ সেই শুভলগ্নে কোন্ অতীত যুগে কালের সেই একটি শ্বেতবিন্দুতে।

তারপর এই তো দেখছিও। মহাব্যোম সমাবৃত ক'রে চন্দ্রমৌলী, ব্যোমকেশ দেবাদিদেব শঙ্কর, আর তাঁরই পাশে—নগরী-বনানী-নদী-প্রান্তর পরিব্যাপ্ত ক'রে সৃষ্টিরূপী নারায়ণ।

মনে মনে বলছি—আমার পথের সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছ দেব, তোমাদের কোটি প্রণাম। তোমাদের কোটি ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ নিজেকেও। কালের স্রোতে যে এই অকিঞ্চন জলবিন্দু—এই ক্ষণায়ু বুদবুদ—সেও আজ ধন্য এই মহামিলনের প্রতিভাস বক্ষে ধারণ ক'রে।

পুল পেরিয়ে আমরা সোনপুরের কূলে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমা উপলক্ষে এইখানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে হরি আর হরের মহামিলনের স্মারকরূপে। মেলাটি নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা; প্রথমটি হচ্ছে রাশিয়ার নিজনি-নভগোরোডে। অত বুঝি না, তবে এত বড় বিপুলায়তন মেলা যে পৃথিবীতে খুব বেশী সম্ভব নয়, একবার দেখলে এটা বেশ বোঝা যায়। বিশেষ করে সব রকম পশু পক্ষী বিক্রির এত বড় হাট। হাতির পাড়ায় ঢুকলে তো কাতারে-কাতারে হাতিই আছে দাঁড়িয়ে, ঘোড়ার পাড়ায় ঢুকলে তো ঘোড়াই, গোরুর পাড়ায় গোরুই। যত রকম হতে পারে ভারতের সমস্ত দেশের প্রতিনিধি, সব বয়সের। সে এক এলাহি কাণ্ড, দেখোনি কখনও। এদিকে, যা জিনিস চাও। যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে; তেমনি সোনপুরের মেলা সম্বন্ধেও হয়তো বলা যায়, যা এখানে পাবে না, তা ভারতের কুত্রাপি পাবে না। নারায়ণীর (বা গণ্ডকীর) ধারে ধারে সাত আট মাইল ধ'রে মেলা বসে, প্রায় মাইল তিনেক ভেতর পর্যন্ত। রাজ্য সরকারের দিক থেকে রাস্তাঘাট প্রস্তুত, আলো জল সরবরাহ এবং সব রকম স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা করা হয়। এক মাস ধরে মেলা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের দম নেওয়ার ফুরসত থাকে না।

অবশ্য কমতে কমতে ক্রমে ঢের কমে এসেছে। যানবাহনের সুবিধার জন্যে এখন সব জিনিসই সব জায়গায় অনায়াসলভ্য হয়ে পড়েছে; এদিকে হাতি-ঘোড়ার রেওয়াজ গেছে একেবারেই কমে, মেলার যুগই তো নয় এটা। তবু সম্ভব হলে কখনও দেখে যেও এসে। একটা অভিজ্ঞতা হবে। তুমি ইতিহাসের ছাত্র, বিহার এক সময় সমস্ত ভারতের যে কত বড় মিলন-ক্ষেত্র ছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে।

শুধু ক্রেতা বিক্রেতা মহাজনদের সমাবেশই তো নয়। কত

পণ্ডিত, কত সাধু, কত রাজনীতিক বা সমাজসেবক দল কত রাজ-রাজড়া, জমিদার-তালুকদারদের ক্যাম্প পড়ে (এগুলো আর অবশ্য এ নামে আজকাল নয়) ; দুজনের মিলন সারা ভারতের মিলনে গিয়ে দাঁড়ায়। শুধু কেনবারই নয়, কিছু করবার, কিছু শোনাবার, এত বিভিন্ন প্রকৃতির এত বড় জন-সমাবেশ তো সুলভ নয়।

"পরশুরাম"-বর্ণিত সেই কাক-মার্গ এইখানেই প্রচারিত হয়েছিল। মনে পড়ছে নিশ্চয়, ভোলবার নয় তো।

আমি একবার গিয়েছিলাম; অবশ্য কাক-মার্গে আকৃষ্ট হয়েই নয়।

আমি তখন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্তমান মহারাজের পিতার। (উভয়েরই পুরা খেতাব মহারাজাধিরাজ)। প্রতি বৎসর হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি কেনার জন্য রাজের ক্যাম্প পড়ত। তাঁর আবার অন্যরকম প্রয়োজনও ছিল। তিনি ছিলেন "ভারত ধর্মমহামণ্ডল"-এর আজীবন সভাপতি। ক্ষেত্রের মেলায় যে বিপুল সাধু সমাগম হতো তার সুযোগে তিনি মহামণ্ডলের কাজ অনেকখানি এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আমায় যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। খরিদ-বিক্রির কাজ ছিল অন্যদের হাতে; মহারাজের অন্যান্য ব্যক্তিগত দপ্তরের সঙ্গে মহা-মণ্ডলের নথিপথ ছিল আমারই হাতে।

সেই আমার সোনপুরের মেলার অভিজ্ঞতা। হলোও তো আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর। হাতি-ঘোড়ার যুগ তখন অব্যাহতই চলছে ; মেলাও পুরোদমে।

কী অভিজ্ঞতা ? সেদিক দিয়ে যদি প্রশ্ন কর তো একটা মেলার কি আর এমন অভিজ্ঞতা হবে ? উৎসব, বিপ্লব, বা ঐ জাতীয় কোন বড় ঐতিহাসিক ঘটনা তো নয়। দুটি কথায় বলা যায়—বৈচিত্র্য আর বিপুলতা ; কিংবা ঐ দুটো কথাই উল্টে-পাল্টে, বৈচিত্র্যের বিপুলতা বা বিপুলতার বৈচিত্র্য।

একটা বিপুলতা হচ্ছে—অমন বিরাট সন্ন্যাসী সমাবেশ আমি তার আগে কখনও দেখিনি, তারপরেও নয়। কী একটা তখন বড় ব্যাপার চলছে—বোধ হয় ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ, যেমন বিবাহের বয়স নির্ণয় বা ঐ জাতীয় কিছু। একটা বিরাট মণ্ডপের নীচে সে প্রায় এ-কূল ও-কূল দেখা যায় না—যত রকম সাধুসন্ন্যাসীদের সম্মেলন। সে এক অরণ্যই যেন। একেবারেই নাগা বা উলঙ্গ সন্ন্যাসী আমি প্রথম সেইখানেই দেখি, কোমরে দড়িটুকু পর্যন্ত নেই। একটা দৃশ্য মনে খুব দাগ দিয়েছিল। এখনও যেন চোখের সামনে দেখছি। মহারাজই ছিলেন সভাপতি। তাঁরই বা অন্য কারুর একটু গরম গরম অভিভাষণে ঐ রকম একজন সন্ন্যাসী হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তাঁকে ঠাণ্ডা করাই যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘছন্দ বিশাল শরীর, কতকটা কৃষ্ণাভই দেহের বর্ণ, মাথায় জটা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শুধু ক্রুদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালন আর হুঙ্কার। তার মধ্যে কোন ভাষা নেই। শুধু নিষ্পেষিত দন্তের মধ্যে দিয়ে একটা "হুম্ হুম্" গর্জন, চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে, ঐ রকম আয়তনেরই কয়েকজন সন্ন্যাসী উঠে সামাল দিতে পারছেন না; বেশ খানিকক্ষণ ধরে সে এক কাণ্ড।

অবশ্য যখন ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া হলো, ব'সে পড়লেন, তখন একেবারে জল। একটি যেন শিশুই ব'সে আছে; সামনে চেয়ে। কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, মুক্ত, আত্মলীন।

কিছু বোঝা যায় না এঁদের।

একেবারে খাঁটি ?…একেবারেই কিছু নয় ?

খাঁটি তো, হিন্দুর এত দুর্দশা কেন আজ ? কিছুই নয় তো থেকে ফল কি ?

আর একটা বিপুলতার কথা মনে পড়ে। ভাবলে চোখ দুটো যেন এখনও ভয়ে আপনা হতে বুজে যায়। ধোঁয়া।

অমন ধোঁয়ার সৃষ্টি আমি কুত্রাপি দেখিনি আর। হবেই তো,

বুঝে দেখো না। সন্ধ্যার আগে থেকে অত লোকের "দক্ষিণ-হস্তের" আয়োজন শুরু হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক, তাদের হাজার হাজার চুল্লি! দুটি জিনিস মনে স্পষ্ট হয়ে আছে আমার। আমাদের ক্যাম্পটা অবশ্য পড়েছিল মেলা থেকে অনেকখানি হটে, স্টেশনের প্রায় কাছে। সম্মেলনের মণ্ডপ থেকে সেখান পর্যন্ত প্রায় তিন-চার মাইল পথ আমি একটা ফিটনে বসে একেবারে চোখে রুমাল দিয়ে এসেছিলাম। এবং আশ্চর্য হয়েছিলাম যারা রয়েছে এর মধ্যে তারা রয়েছে কি ক'রে। সব রকম কাজকর্মই তো হচ্ছে।

আর একটা অভিজ্ঞতা আছে। তবে তার মেলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; যে কোন জায়গায় ঘটতে পারত। তবে ঐ দিনটারই ঘটনা বলে এইখানেই উল্লেখ করা চলে। একটু রগড় আছে।

আমাদের সঙ্গে দুই কুমারও গিয়েছিলেন। বর্তমান যিনি মহারাজ আর তাঁর ছোট ভাই, পরে রাজাবাহাদুর খেতাব পান। তখন তো ছেলেমানুষই, ছাত্রাবস্থা চলছে। দুষ্টু বুদ্ধিটুকু বেশ পুরোমাত্রায় রয়েছে।

আরও একটু ভূমিকা দরকার। এঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা নিছক রাজে চাকরি করা নিয়েই ছিল না। আমার এক জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভ্রাতা (গোষ্ঠবাবুর পরিচয় তুমি জান) দুই ভাইয়ের তখন গৃহশিক্ষক। সেই সূত্রে একেবারেই ছেলেবেলা থেকে ওঁদের দুজনের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা ছিল আমাদের। কর্মচারী হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই এবং ও-সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক একটা হৃদ্যতা ছিল। তার মধ্যে হাসি-তামাশা এসে পড়তেও বাধা ছিল না।

সেদিন সকাল বেলার কথা। মহারাজ ক্যাম্পে থাকলে কাজকর্ম আমার খুব কমই থাকত। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য একটা আলাদা শামিয়ানা ছিল, গালিচা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। কে আর কত আসছে? ঐখানেই বেশির ভাগ কাটত আমাদের—ওঁরা দুজন, মহারাজের খাস আফিসের আমরা দুজন বাঙালী কর্মচারী, ওদিককার কিছু কিছু দরবারী; কখনও মজলিস হালকা, কখন ভারি।

অফিসে যেটুকু কাজ ছিল সেরে শামিয়ানায় গিয়ে দেখি, মজলিস ষোলকলায় পূর্ণ একবারে। একজন গনৎকার কোথা থেকে এসে জুটেছে, তাকে ঘেরে ঘরে দাঁড়িয়েছে সবাই, ওঁরা দুজনেও আছেন, হাতের ওপর হাত সামনে গিয়ে পড়ছে, প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। মুখরোচক করে বলছে লোকটা, সত্যি যা তা সাধ মতো খোঁজ নিয়েই এসেছে, মিথ্যাকেও সামলে-সুমলে এগুবার ক্ষমতা তো অর্জনই করা। জ্যোতিষবিদ্যা যাই হোক, এদের বিদ্যাটা তো একটা সুপরিকল্পিত আলাদা আর্টই।

আমি গিয়ে উপস্থিত হতে বড় ভাই চোখ তুলে একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে একটু যেন অন্যমনস্ক মুখে একটু যেন দুষ্টুমির হাসি ফুটি-ফুটি করছে (চিনি তো); প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার মহারাজকুমার?"

গনৎকারের চারিদিকে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘিরে ফেলেছে। উনি আমায় ইশারায় ডেকে একটু অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। বললেন "আপনাকে হাত দেখাতে হবে বিভুতিবাবু।"

হেসে বললাম—"আমি তো ওসব বিশ্বাসই করি না, হুজুর, ভালো বললে মিথ্যা আশা, মন্দ বললে সত্যিকার ভয়।"

"আমিই যেন কত করি! বলি, পরীক্ষা করতে হবে তো লোকটাকে, না, সবাইকে বোকা বুঝিয়ে দক্ষিণে নিয়ে চলে যাবে? না, অমত করবেন না। আপনি হচ্ছেন পরীক্ষার একেবারে যোগ্যতম লোক।"

বললাম—"কিছু যে জানি না ও সম্বন্ধে।"

"কিছু জানতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু হাতটা বাড়িয়ে বসে থাকবেন সওয়াল যা করবার আমিই করব।...আর, বেশ গম্ভীর হয়ে থাকবেন। স্কুলের হেডমাস্টারি আপনাকে করেই দিয়েছে গম্ভীর; শুধু মনে মনে ভাববেন—আমার মতন এক-ক্লাস শান্ত-শিষ্ট ছেলে নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। আসুন।"

এগিয়ে গিয়ে বললেন—"সরো, সরো তোমরা। বিভূতিবাবু এসেছেন। ভয়ানক বিশ্বাস ওঁর, দেখিয়ে নিতে চান। আবার এক্ষুনি হয়তো বাবার ডাক পড়বে, হবেই না আর।"

সবাই সরে গেল। আমি একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

একটু পরিচয় দিয়ে দিলেন উনি। দিয়ে বললেন, "বুঝছেনই তো, বাবার খাস আফিসের মালিক, ওঁর বিশ্বাস জন্মাতে পারলেই বাবা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা-সাক্ষাৎ করানো ওঁরই হাতে। দেওয়াথোওয়া সেও উনিই ঠিক করে দেন, কেমন লোক, কি বৃত্তান্ত সেসব বুঝে। একটু ধীরে-সুস্থে রেখা-বিচার ক'রে দেখুন।"

ছোট ভাই একটু বেশী চঞ্চল, বিশ্বাসের দিকটা আরও কমই এবং দুষ্টবুদ্ধি বা নাকাল করার প্রবৃত্তিটা স্বভাবতই আরও একটু বেশী। "ভাইয়া" যে কিছু-একটা মতলব এঁটেই পাশে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায় সেটা আন্দাজই করেছেন; দুজনের একটু চতুর দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। বড় ইশারা করে দিলেন, উনি যেন কিছু না বলেন।

গনৎকার এদিকে আমার হাত নিয়ে পড়েছে। ডান হাত চিত ক'রে ধরে বেশ চাড় দিয়ে দিয়ে রেখাগুলো জাগিয়ে তুলল, বার দুই বেশ চেপে চেপে মুছে নিল, তারপর একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"আপনি তো বাঙালী দেখছি।"

সময় নিচ্ছে। ওটা তো নামেই ধরেছে, চেহারাতেও কিছু আছেই লেখা। মাথা নেড়ে জানালাম—"হ্যাঁ।"

"দীর্ঘায়ু আপনি—এখন যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে প্রায় আশির কাছে পর্যন্ত উঠে গেছে রেখা।"

"সেটা তো বোধ হয় আমরা কেউ…"—ছোট শুরু করেছিলেন, "বাবুজী, তুমি চুপ করো!"—ব'লে একটু কৃত্রিম ধমক দিয়েই উঠলেন বড়, বললেন—"বাধা পেলে ওঁর গণনায় ভুল হয়ে যেতে পারে তো?

তোমার অঙ্ক কষার সময় যতীনদাই এসে ঢুকে দিলে কেমন হয়? বকুনি খাও তো মাস্টার সাহেবের কাছে।"

যে-ভাবেই হোক কালক্ষেপ তো দরকারই, গনৎকার মুখ তুলে হেসে বলল—"না হুজুর, উনি বলুন না। ছেলেমানুষ, তাতেই যদি আনন্দ পান। আমার গণনা কি তাতে একটুও এদিক-ওদিক হতে পারে? তা হলে ছেড়েই দেব না এ ব্যবসা একেবারে?"

ঝুঁকে পড়ল হাতের ওপর।

"একটা খুব বড় ফাঁড়া গেছে···ছেলে-বেলায়···এই—দাঁড়ান দেখি ···এই আট বছরের মাথায়।"

"কি বিভূতিবাবু?"—বড় প্রশ্ন করলেন।

ধরেছে ঠিক। তার একটা নিশানা রয়েছে আমার শরীরে। খুব সূক্ষ্মই, তবে ওদের চতুর সন্ধানী দৃষ্টিতে না পড়বার মতো নয় একেবারে। বয়সটা ধরেছে আন্দাজেই, এই কাণ্ডই তো করছে। তবে লেগে গেছে মোটামুটি ঠিকই; যে ধরনের চিহ্ন সে ধরনের ফাঁড়ার ত বয়সও যে ঐটেই।

বললাম—"ঠিক বলেছেন হুজুর।"

"কী ধরনের ফাঁড়া?"—সঠিক উত্তর তো মুখরোচক হওয়ার কথা নয়। আমায়ই প্রশ্ন করলেন উনি।

"বাঃ, সে তো আমিই বলব।"—গনৎকার একটু দম্ভের সঙ্গেই বলে উঠল। "তবে কোষ্ঠীটা থাকলে যেমন নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারতুম, এখন তা পারব না। এখন শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ফাঁড়াটা বাম অঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছিল কোথাও।"

কথাটা বুঝছ না? সূক্ষ্ম চিহ্নটা প্রকাশ করে দিলেও তো সব মাটি। "কী বিভূতিবাবু?"

বললাম—"ঠিকই হুজুর।"

আমারও তো রহস্য ভেদ করবার সময় আসেনি। জানি ওঁদের

হাতে হরতনের টেক্কা, বাজি মাত হবেই, চলুক না যতক্ষণ চলে ছুটির আসর।

একটু যেন দমেই গেছেন মহারাজকুমার! জমায়েতের মধ্যে এক পাশে কানে গেল, একজন দরবারী অন্য একজনকে মৈথিল' ভাষায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলছে—"হে, লেল্লক মোট বকশিশ আব।"

অর্থাৎ এবার করলে আদায় মোটা বকশিশ।

"বেশ, তারপর?"—ওকেই প্রশ্ন করলাম।

"ভবিষ্যৎ, না, অতীত?"

নিজেই বলল—"বেশ আয়ুর কথা উঠল তো সেইটেই আগে সেরে নিই—একেবারে শেষের দিকে গিয়ে আর একটা বড় ফাঁড়া আছে।"

"আশি বছরে—যেদিন মারা যাবেন?"—ছোট আর থাকতে পারলেন না। অনেকেই হাসি চেপে আছে; একটু ছলকে উঠল। বড় ধমক দিয়ে উঠলেন—"আবার ভাইজী!"

"আর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল—চাকরির দিক দিয়ে এই দরবারেই একটার পর একটা বড় চাকরি করে যাবেন।"

আর একটা আন্দাজই, এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটুকু দেখে। মহারাজকুমার এবার নিজেই মাথা দুলিয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—"আমি তো গদিতে উঠেই ডিস্‌-মিস্ করে দেব ওঁকে। বড় ফাঁকিবাজ!"

বেশ একটু হাসি উঠল এবার। হাসিই আসছে এগিয়ে ক্রমে, উনিও আর সামলাতে পারছেন না। পারবেনও না যে আর বেশীক্ষণ সেটুকু উপলব্ধি করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—"থাক ওসব কথা, কোথায় চাকরি করবেন, কবে যাবেন সবার মায়া কাটিয়ে এটা ওঁর কাছে তেমন বড় কথা নয় নিশ্চয়। বর্তমানে ওঁর সবচেয়ে যা বড় সমস্যা তাই নিয়েই আপনি বরং বলুন কিছু। জেনে নিয়ে দেখা যাক কিছু তুকতাক যদি চলে। নানারকম সাধু-মহাত্মার আমদানি তো হয়েছে মেলায়। কি বলেন বিভূতিবাবু?"

বললাম—"তা হলে তো খুবই ভালো হয়।"

"তা হলে বলুন ওঁকে সমস্যাটা কি। অন্তত কি ধরনের।"—সঙ্গে সঙ্গে চোখের খুব সূক্ষ্ম একটু টিপ আমার দিকে চেয়ে।

তার দরকার নেই; বুঝেই তো গেছি উদ্দেশ্যটা; একেবারে গোড়াতেই। কিন্তু বাধছে যেন, একেবারে অতটা হালকা হয়ে যেতে। একটু হেসে বললাম—"সেও তো উনিই হাত দেখে বলবেন।"

"ঐ নিন। 'তা হলে আপনিই বলুন—সমস্যাটা কি।"—গনৎকারকে বললেন।

"সমস্যা..."

কথাটা টেনে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে চাইল গনৎকার, বলল—"সমস্যা তো ওঁর এখন অনেকগুলি একসঙ্গে রয়েছে দেখছি..."

"কোন্‌টা বড় তার মধ্যে ?"

"বড়...

"ওটা ওঁরই সমস্যায় দাঁড়িয়েছে এখন।"—ছোটর ছোট্ট মন্তব্যটিতে আবার একটু হাসি উঠেছে, মহারাজকুমার বলে উঠলেন—"থাক, অত-বম্‌-বখেড়া। এই তো আমার মনে পড়ে গেছে। আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এখন ছেলেদের পড়া আর মেয়ের বিবাহ—বলেছিলেন তো সেদিন..."

ইশারাটুকু সেরে নিয়ে গনৎকারের দিকে চেয়ে বললেন—"পড়ার ভাবনা তো আছেই। আপনি মেয়ের বিয়ের কথাটাই আগে বলুন—কবে নাগাদ রেহাই পাবেন বেচারী।"

হাসি চেপে সবাই হাঁ করে আছে দাঁড়িয়ে।

হাতটা খুব উলটে পালটে দেখল—বেশ হেঁট হয়ে, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে এবার কিসের আন্দাজ করে বলল—"তা বাবুজী বছরখানেক আপনার চিন্তা লেগে থাকবে।...তবে জামাই পাবেন খুব ভালো।"

মহারাজ গেছেন বাইরে, মন্দিরেই পূজা আজ। হো-হো ক'রে

যে তুমুল হাসি উঠল তাতে মনে হলো সমস্ত শামিয়ানাটা দেবে উড়িয়ে।

সহজে হটলে তো চলে না ওদের।—"কি হলো? হয়ে গেছে বিয়ে? দেখি তো হাতটা আর একবার—যা গোলমাল!"

"বিয়েই করেননি তো মেয়ে—মেয়েই নেই তো তার বিয়ে আর ভালো জামাই!"

দরবারীদের মধ্যেই কে বলে উঠল—ঐ হাসির মধ্যেই—আরও বাড়িয়ে দিয়ে। হয়ই তো একটু আলগা মুখ ওদের।

ওকে নিয়েই পড়বে এবার, জানি তো দরবারীদের কাণ্ড। মহারাজকুমারের মুখের দিকে একটু অ্যাপীলের নজরে চেয়ে ইশারা করলাম এবার আমিই—অর্থাৎ—"হলো তো, আর কেন?"

"আচ্ছা, এবার তোমরা সব যাও—খালি করো শামিয়ানা।" একজনকে গোটা পাঁচিশেক টাকা এনে দিয়ে দিতে আদেশ করে, ছোটকে নে [illegible] হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেলেন।

আমাদের গাড়িটা মেলার জমির ওপর দিয়ে চলেছে। নদীর পুলটা শেষ হলে তারই সমতলে রেললাইনটা কতকগুলো ইঁটের খিলানের ওপ[illegible] দূর পর্যন্ত চলে গেছে, তা প্রায় মাইল খানেকের কাছাকাছি। দু দিকে মেলা প্রাঙ্গণ, আমের বাগান, মাঝে মাঝে খালি জমিও, খিলানের ভেতর দিয়ে দু দিকে যাতায়াত করে লোকে। জল-সরবরাহের জন্য একটা স্থায়ী জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে কয়েকটা উঁচু কংক্রিটের থামের ওপর, একটা পাকা বাড়িও, সম্ভবত মেলার সময় আফিস হয়।

খিলানগুলো শেষ হয়ে একটু পরেই আমরা সোনপুর স্টেশনের ইয়ার্ডে প্রবেশ করলাম; গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়াল।

সোনপুর নাকি দুটা জিনিসে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার সঙ্গে টেক্কা দেয়, এক তো মেলার কথা বললামই, দ্বিতীয় হচ্ছে এর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। এটা নাকি আবার দৈর্ঘ্যে সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

কিন্তু খুব কি বাহাদুরি একটা?

আগেই বলেছি বি এন ডব্লিউর হিসাবের কড়াক্কড়ির কথা। এখন অবশ্য (এন ই রেলওয়ে নামে) এটা ভারত সরকারের সম্পত্ত; আর সব রেলের মতোই এক আইন, এক পলিসি বা কর্মপদ্ধতি, কিন্তু কোম্পানীর আমলে অন্যরকম ব্যাপার ছিল। অত্যন্ত হিসেবী, অত্যন্ত কিপ্‌টে। আমদানির দিকে খুব কড়া দৃষ্টি, কিন্তু যাদের কাছ থেকে আমদানি—যাত্রীসমাজ—তাদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে একেবারে অন্ধ। সেই যে কথায় বলে না—"নেবো লাল দেবো না রাম"—কোম্পানী হুবহু তাই। আগে একবার তোমায় বলেছি—এ কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার ছিলেন নাকি স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজা। জাতটা বেনিয়া, তাদের রাজা, বুঝতেই পার।

দীর্ঘতম হওয়ার যশ নিক, কিন্তু প্ল্যাটফর্মটা ঐ পলিসিরই জলন্ত নিদর্শন একটা।

প্ল্যাটফর্ম থাকবে পাশাপাশি, ওপরে টানা পুল, টুপ করে পেরিয়ে পৌঁছে যাবে যাত্রী, এক নম্বর থেকে যদি পাঁচ নম্বরেও যেতে হয় তো কুছ পরোয়া নেই। সোনপুরের পৃথিবীর লম্বতম প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হলে, যাকে বলা যায় রীতিমত চাল-চিড়ে বেঁধে নিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের। গাড়ি প্রায়ই লেট। তাই না হয় এ গাড়ির জন্যে ও গাড়িটাও একটু দাঁড়িয়ে থাক। তা তো নয়, গিয়ে হয়তো দেখলে—প্ল্যাটফর্মের ও প্রান্ত ফরসা, এ ঢুকেছে খবর পেতে যেটুকু দেরি, তারপর ও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। যেন ভাসুর-ভাদ্দরবউ, মুখ দেখাদেখি নেই। পাশাপাশি থাকলে লোকে ছুটে গিয়ে আপদ্‌-ধর্মে "কোথা যাও মা?" বলে ভাদ্দর-বউয়ের আঁচলটা চেপেও একটু থামাতে পারে, চেনটা তো রয়েছে, এ একেবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু; সম্ভব তো নয়।

"নেবো লাল দেবো না রামের" আরও কীর্তি আছে। সোনপুরের মেলার যেটুকু ধারণা পেয়েছ তা থেকে এই সময়ে কোম্পানীর

আয়ের বহরটা যে কি হতে পারে তার একটা আন্দাজ করে নিতে পারবে। কিন্তু, আশ্চর্য হবে, পৃথিবীর এই দ্বিতীয় মহামেলা সামলাবার জন্যে কতকগুলো টিকিটের ঘর বাড়ানো ভিন্ন আর কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। মনে রাখতে হবে, ওটা হচ্ছে নিছক আমদানির দিক।

স্পেশ্যাল ট্রেন কি বস্তু লোকের কোন ধারণাই ছিল না, অর্থাৎ স্পেশ্যাল প্যাসেঞ্জার বা যাত্রীবাহী ট্রেন। মালগাড়িতে যত চড়বে চড়ো না—ঢালোয়া ব্যবস্থা। হ্যাঁ, সাধারণ মালগাড়ি, আদি, অকৃত্রিম। গরু, ঘোড়া, ছাগলের মতোই বোঝাই হয়ে যাত্রীরা আসছে, যাচ্ছে। জায়গা না পাও, ওদের সঙ্গেও যেতে পার, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই কোম্পানীর।

এক হিসাবে খোদ রাজার দৃষ্টিও প্রজাদের ওপর যখন এই রকম ছিল, নীলকর বা চা-করদের অত দুষলে চলবে কেন?

কমিয়ে-বাড়িয়ে, কমিয়ে-বাড়িয়ে গাড়ি প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরি ক'রে ফেলল, পৌঁছবার কথা আটটায়, পৌঁছল দশটার পরে। যাক, শেষ হয়ে এসেছে কোনরকম করে। এর পর পালেজা ঘাটে গঙ্গার স্টীমার, তারপরে পাটনা, অবশ্য একা নদী বিশ কোশ—এই যা একটু চিন্তা।

দশটার সময় বাসায় পৌঁছুবার কথা, তার জায়গায় বারোটারও পরে পৌঁছাচ্ছি; খাওয়ার পাট এইখানেই চুকিয়ে নিতে হবে।

সোনপুর একটা বড় জংশনও, চারটে লাইন এসে মিশেছে এখানে—মজঃফরপুর, শাহপুর পটোরি, ছাপরা আর পালেজা ঘাট। মজঃফরপুর আর শাহপুর পটোরির লাইন দুটো অবশ্য আগের স্টেশন হাজিপুরেই মিলে গেছে, তবে সে মাত্র একটা স্টেশন আগে। ফলে জটিলতা বড্ড বেশী। আমাদের গাড়ির কথাই ধরা যাক, এতে ওঠানামা করতে—ছাপরা সেকশনে ছাপরা নিয়ে তিনটে বড় বড় সেকশনের লোক; ছাপরা, বারাণসী, গোরক্ষপুর; পাটোরি টানবে কাটিহার

সেকশনের লোক, তারপর সামনে তো পাটনা রয়েছেই। গাড়ি আসার পর খানকটা পর্যন্ত জায়গা আগলে মোটঘাটের দিকে নজর রেখে বসে থাকতে হল। বেশ থিতিয়ে জিরিয়ে গেলে উদরের ফিকিরে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশন হোটেলের ওয়েটারদের পথ চেয়ে আছি প্ল্যাটফর্মে নেমে কখনও কখনও এমন হয় যে, হাজিপুর থেকেও সঙ্গ নেয়, আজ যখন এত দরকার, একজনও যে চোখে পড়ে না। গাড়ি ছেড়ে যেতে সাহস হয় না। অবশ্য প্যাসেঞ্জার যাদের নামবার নেমে গেছে; যাদের ওঠবার, তারা গুছিয়ে-গাছিয়ে বসেছে। তবু হালকা হয়ে উঠে ভারি হয়ে নামবার মতলবে কেউ ওঠেনি, এ কথাও তো বলা যায় না।

মুশকিলে পড়েছি, গাড়ি লেট। কখন বা দেয় ছেড়ে। এদিকে ক্ষিধেয় যেন নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে আসছে। সেই কোন্ সকালে এক মুঠো ভাত মুখে দিয়ে বেরুনো গেছে তো।

এখানে ইঞ্জিন বদলায়। ভারি ইঞ্জিন, যেটা এতক্ষণ টেনে নিয়ে এল গাড়িটাকে সেটা তো আর এগুতে পারবে না, মাইল দু তিন গিয়েই বালির চড়ার ওপর দিয়ে লাইন।

গাড়িতে সামনের দিক দিয়ে একটা ধাক্কা লাগল; হালকা ইঞ্জিনটা এসে জুড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

মনে হলো যেন গার্ড সাহেব যাচ্ছেন সামনে দিয়ে। এই গাড়িরই কি? একটু ধোঁকা হওয়ার কারণ আছে। একটা গাড়ি, লেট যাচ্ছে, ছাড়বার জন্যে তোড়জোড় সং ঠিক, তার গার্ডের যেমন একটু ক্ষিপ্রতা আশা করা যায়, অন্তত ইংরাজের আমল থেকে যেমন আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেরকম কিছুই নয়। ভদ্রলোকের বয়সও হয়েছে। একটু ঝুঁকে চিন্তিতভাবে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের দিক থেকে নিজের গাড়ির দিকে চলেছেন। অবশ্য যদি হনই গার্ড। যাই হোক, সন্দেহ থাকলেও একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—"এ জনাব, জরা শুনিয়ে তো।"

দাঁড়িয়ে পড়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন; একটু যেন দেখে নেওয়ার ভাব, তারপর ভালো করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"জনাব নয়, বাঙালী, কি বলবেন বলুন।"

গম্ভীর, একটু যেন বিরক্তও। একটু খোশামোদের হাসি হেসে বললাম—"বাঃ, বেশ ভালোই হলো। জিগ্যেস করছিলুম, গাড়ি ছাড়তে আর কতটা সময় আছে?"

"একেবারে নেই। থাকা উচিত নয়।"

উত্তরের ভাবটা দেখে একটু ধাঁধায়ই পড়ে যেতে হলো। আমতা আমতা করে বললাম—"ওঃ! থাক, তা হলে আর হলো না। মিছিমিছি আপনাকে দাঁড় করালাম, মাফ করবেন।"

দু পা এগিয়ে এসে বললেন—"মাফ করবার কোন কথা নয়; যা অবস্থা দাঁড় করিয়েছে তাই বললাম। সময় দরকার আপনার? তা কতটা? দশ মিনিট—আধ ঘন্টা?"

ডান হাতে একটা ঝোঁক দিয়ে বললেন—"একঘন্টা?"

"আপনি এই গাড়ির গার্ড তো?" একটু কুণ্ঠিতভাবে করতেই হলো প্রশ্নটা। কথাবার্তার ভাবে যায় না একটু সন্দেহ ধরে?

"এবং এই গাড়িরই ইঞ্জিন থেকে আসছি। তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম; ল্যাজ মুখে করে ফিরে আসছি।"

"ব্যাপারখানা কি? ছাড়বে না গাড়ি আজ?"

"ভগবানও বলতে পারেন না। একমাত্র পারেন বেহাই..."

অপলক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আর এক পা এগিয়ে এসে আমার বুকের মাঝখানে চারটে আঙ্গুল চেপে প্রশ্ন করলেন—"মশায়, আপনিও বাঙালী আমিও বাঙালী, বয়সও হয়েছে আপনার, এমন কাণ্ড কখনও দেখেছেন? যদি জিগ্যেস করেন—আপনারও তো বয়েস হয়েছে, আপনি দেখেছেন কি না, তো—মিথ্যে কথা তো বলতে পারব না, দেখেছি, ঢের দেখেছি, দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে, না মরি তো আরও কিছু দিন দেখতে হবে; এখনও পাঁচ বছর..."

"ব্যাপারখানা কি?" অধৈর্যই হয়ে পড়েছি। প্রশ্নটা অবশ্য মন ঘুগিয়ে একটু হেসেই করবার চেষ্টা করলাম।

"কি নয়, তাই বরং জিগ্যেস করুন। দু ঘণ্টা লেট যাচ্ছে গাড়ি (বুক পকেট থেকে পুরনো আমলের একটা বড় ঘড়ি বের করে দেখে নিয়ে)—এখন ঠিক দু' ঘণ্টা সাত মিনিট। লাইন ক্লিয়ার লিখিয়ে টিকিয়ে নিজের হাতে করে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ইঞ্জিনটি এসে জুড়বে, হুইসিল দিয়ে স্টার্ট করিয়ে দেব। এলোও ইঞ্জিন, কাপলিং (Coupling) লাগানোও হলো, লাইন ক্লিয়ার তুলে দিয়েছি ড্রাইভার সাহেবের হাতে, উনি উদিকে হুইসিলের তারে হাত দিয়েছেন, টানতে যাবেন এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বছর দশ-বারোর ছোকরা এসে হাজির। নীল হাফপ্যান্ট পরা, গায়ে একটা গেঞ্জি—পরিত্রা হ ছুটে এসেছে, মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখে..."

কী মনে হতে প্রশ্ন করলাম—"অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান?"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার?"

—ভ্রূ দুটো যতটা সম্ভব কুঁচকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন গার্ড সাহেব—"অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ও বালাই আছে—বেহাই? তা হলে অমন ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করতে পারত? ছেলে বেরিয়ে গেল, এদিক থেকে মেয়ে বেরিয়ে এল, হাত ধরাধরি করে মাঠে ঘাটে যেখানে সুবিধে পেলে লভ্ করলে, গির্জেয় গিয়ে বিয়ে করলে, ল্যাঠা চুকে গেল; বাপ-ব্যাটারা নিজের নিজের ধান্ধা নিয়ে থাক্। কে তাদের পুছছে মশাই? ও ঝঞ্ঝাট ওরা এর মধ্যে আনে? আচ্ছা এই তো—কনের ইংরিজী বলুন।"

গার্ড সাহেবই সঙ্গে, নিশ্চিন্ত আছি গাড়ির সম্বন্ধে, তবু ধৈর্য ধরে রাখাও তো শক্ত। তাগাদা দিলেন—"বলুন না দাদা।"

বললাম—"ব্রাইড।"

"বর?"

"ব্রাইডগ্রুম।"

"স্বামী?"

"হাসব্যাণ্ড্।"

"স্ত্রী?"

"ওয়াইফ।"

"বেহাই?"

"ব্রাইডগ্রুমস···" উদ্দেশ্যটা বুঝে একটু থতমত খেয়েই আরম্ভ করেছি, উনি বাধা দিয়ে বললেন—"ব্রাইডগ্রুমস ফাদার এইতো বলবেন? কিন্তু কেন মশাই এ অবিচার? এক কথায় বলতে হবে। ব্রাইডগ্রুমস ফাদার—সে তো ব্রাইডের শ্বশুরও, এদিকে তাদের ভাই-বোনদের তাউই মশায়ও। তাকে ছেঁটেছুঁটে শুধু যে বেহাইটিই করে রাখবেন কী অধিকারটা আপনার? ···বলুন।"

"হ্যাঁ, তা তো দেখছি।"—মাথা চুলকে বললাম

"পথে আসুন। তা হলেই দাঁড়াচ্ছে—ও বালাই নেই বলেই তার ভাষাও নেই। আমি আরও সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, দূরেও যেতে হবে না। এই যে ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাংলাটা কি? বলুন।

"···বলুন না।"

"গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার···"

—সাবধানেই এগুচ্ছিলাম, হাত নেড়ে বললেন—"হলো না ও হলো না! বুঝেছি, বলবেন গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার বাষ্পীয় কল। আজ্ঞে না, মানব কেন? এক কথায় বলতে হবে। পারবেন না, রাষ্ট্রীয় ভাষা পর্যন্ত সাহস করেনি—গলায় বাঁধবার নেকটাইকে 'কণ্ঠ-লঙ্গোটি' করেছে।···আস্পর্দ্ধাটা দেখুন, লঙ্গোটি কোথাকার জিনিস. তাকে টেনে গলায় তুলেছে! কিন্তু এ বাছাধনকে ঘাঁটাবার চেষ্টা করেনি, যে ইঞ্জিন, সেই ইঞ্জিনই চলছে এখনও। কি প্রমাণ হয় বলুন না এ থেকে?"

বললাম—"জিনিসটা ছিল না আমাদের দেশে।"

"হলো তো? 'বেহাই'—ও তাই। ওদের ও হ্যাঙ্গামাটাই নেই; কথা কোথা থেকে আসবে বলুন।...আর থাকলে কখনও এত বড় রাজ্যটা শাসন করতে পারত মশায়? বেহাই-বেহাইনের হেফাজত নিয়েই পড়ে থাকতে হতো।"

তত্ত্বটা পরিষ্কার করে দিয়ে মুখের দিকে একটু হাসি নিয়ে চেয়ে রইলেন। মনে করিয়ে দিলাম—"বলছিলেন একটা ছোকরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে দাঁড়াল।"

"বাবুজী, সম্‌ধি আইল বাড়ন।" চোখ বড় বড় করে বললেন উনি—"সম্‌ধি মানে হচ্ছে বেহাই, স্যার। বাবার বেহাই এসেছে—ভাই কিংবা বোনের শ্বশুর আর কি, খবর দিতে এসেছে বাপকে। প্রায় টেনে দিয়েছিল হুইসিলের তারটা, হাতটা সরিয়ে নিলে যেন ইলেকট্রিকের শক্‌ লেগেছে মশায়, এই গঙ্গামুখো দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না আপনাকে। ছেড়ে দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। জানি তো ব্যাপারটা কি, এই করছি সেই কোম্পানীর আমল থেকে। বললুম—"না ড্রাইভার সায়েব, দু' ঘণ্টা লেট—স্টীমারের সঙ্গে কনেকশন, কোনমতেই আর আমি দেরি করতে পারিনে।" নেমে এসে হাতটা চেপে ধরলে—পাঁচ মিনিট, ঠিক পাঁচ মিনিটই গার্ড সায়েব। দুটো খাতিরের কথা বলেই চলে আসছি। কোন-মতেই রাজী হব না, শেষে হাত ছেড়ে দাঁড়ি—বেইজ্জত হয়ে যাব গার্ড সায়েব।' ...গাড়ি লেট আছেই, আরও নয় পাঁচ মিনিট।....মর গে যা—বলে এই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি। কি কাজ আপনার?"

"যেতে দিলেন আপনি?" নিজের কথা ভুলেই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

"নিন! যেতে দেওয়ার মালিক যেন আমি! ও যাবেই, আবহমান কাল থেকে এইরকম গিয়ে আসছে। আজ না-হয় কড়াকড়ি, কিন্তু

অভ্যেসটা তো যাবার নয়। 'আর এই নিয়ে গার্ডে-ড্রাইভারে তো একটা কেলেঙ্কারি করা চলে না। পাবলিক রয়েছে হাঁ করে; ওদিকে কাগজওয়ালারা রয়েছে, তারপর কাউনসিল রয়েছে। ঘরের কেচ্ছা কে বের করতে চায় তা বলুন?"

"কিন্তু দেখলই তো পাবলিক।"

"গাড়িতে ইঞ্জিন জুড়ে গেছে, লেট গাড়ি এইবার হুইসিল দিয়ে ছাড়বে, যে যার জায়গায় উঠে চেপে বসেছে। কই, দেখান প্ল্যাটফর্মে একটা লোক, "এক আপনি ছাড়া।"

এমুড়ো ওমুড়ো চেয়ে নিলেন, ওঁর সঙ্গে আমিও। বললেন—"এর ওপর ওদিকটা তো প্ল্যাটফর্মের শেষই, একটু অন্ধকার। তারপর ইঞ্জিনের পর একটা মালগাড়ি, তারপর ব্রেকভ্যান, তারপর তো আপনার পাবলিক। আর, তার পরেও কারচুপি নেই? এই তো আপনিও পাবলিক একজন। যান না দেখে আসুন গিয়ে নালিশ আপনার ধোপে টেঁকবে কি টেঁকবে না, যাচাই করেই আসুন না। ...আসুনই না হয় আমার সঙ্গে, এই তো ক' পা-ই বা।"

এগিয়েছেন, আমি থামিয়ে বললাম—"থাক, গিয়ে আর ফল কি? কারচুপিটা কি, না-হয় আপনার কাছেই শুনে নিই।"

"পকেট থেকে নোটবুক বের করে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দেখবেন, ফায়ারম্যান বেটা নেমে এটা ঠুকছে, ওটা ঠুকছে, এখানে স্ক্রু কষছে, ওখানে ঢিলে করছে। জিগ্যেস করলেন ড্রাইভার কোথায়? ...ড্রাইভার লোবো শেডে গেছে মশায়—ইঞ্জিন বিগড়েছে, যন্ত্রপাতি আনতে গেছে। নিন্, কি নোট করবেন করুন। আপনি হয়ত উকিল, না-হয় ডাক্তার, না-হয় ডেপুটিই একজন, ইঞ্জিনের, কোন্‌টা বিগড়ুলে কি যন্ত্রপাতি লাগবে, তার কি বোঝেন স্যার? বাকি পাবলিক?" "চ্যু"—করে জিহ্বা-তালুতে একটা শব্দ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন আমার। রাগও নয়, বিরক্তিও নয়। মুখে যে হাসিটা আস্তে আস্তে ফুটে

উঠছে, সেটা বিজয়ের। এখন যেন ওঁরা রেলের সব এক ধারে ; আমরা পাবলিক এক ধারে। আবহমান কাল থেকে কি করে আমাদের বোকা বানিয়ে আসছেন, তার একটা নমুনা ঝেড়ে দিয়ে, "আচ্ছা, নমস্কার" বলে আগের চেয়ে বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গেই ঘুরে পা বাড়ালেন। বিজয় উৎসাহই বলি না।

ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছি। কয়েক পা গেলে হুঁশ হলো, হেসে বলবাম—"শুনছেন? তা হলে আমি হয়ে আসি একটু? পাব তো সময়?"

"অন্তত দু ছিলিম তামাক পুড়বে, তার সঙ্গে ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেওয়া আছে, কোন না একটু ফাস্টি-নস্টিও, বেহাই-ই তো, রসের সম্বন্ধ। কোথায় আছেন আপনি? আর এসেই যদি পড়ে তো এবার তো আমার পালা। বললুম না? কত সময় চান—আধ ঘণ্টা—পুরোপুরি এক?" সেই চতুর হাসি মুখে নিজেই ঘুরতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন, প্রশ্ন করলেন—"তা দরকারটা কি?"

"একবার রিফ্রেশমেন্ট রুমে গিয়ে এক প্লেট খাবার দিয়ে যেতে বলব।"

"খাবার? আজকে। আপনি কি দিনক্ষণ দেখে বেরুননি মশায়? যাত্রা-অযাত্রা মানেন, না? বয়স তো হয়েছে ; তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়ার মতন তরুণ নয় তো আর..." এগিয়েই আসছিলেন, হঠাৎ কি ভেবে আবার থেমে গিয়ে বললেন—"যান, দেখুন স্বচক্ষে, আমি বলে পাপের ভাগী হই কেন? আচ্ছা নমস্কার।"

ওর সঙ্গে, কেন জানি না, একটা উঃ করে শব্দ করে ঘুরে চলে গেলেন।

অযাত্রা আবার নতুন কি দেখাবে?

তবে অত ভাববার সময় নেই। ক্ষিদেটা আরও একটু বেড়েই উঠেছে তো। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, মনে পড়তে আরও যেন অসহ্য হয়ে উঠছে, তার ওপর আবার এই এক অশুভ ইঙ্গিত।

আগে গিয়ে মাছ-মাংসের ঘরটাতেই ঢুকলাম।

কেউ নেই। ডাকাডাকি করতে একটা লোক বেরিয়ে এল। ওয়াটার নয়, মাজাঘষা করবার চাকর ব'লে মনে হল।

বললাম—"কেউ নেই দিখছি। আমার এক প্লেট পরোটা, এক প্লেট মাংস আর এক প্লেট্...."

"কুছ্ নোহ হ্যায়।" —বাধা দিয়ে জানাল লোকটা।

"একটু টোস্ট-বিস্কুট—অমলেটের জন্মে আণ্ডা..." —কথাগুলো উচ্চারণ করতেও এত মিষ্টি লাগছে।

"কুছ্ নেহি হ্যায়।" —এবার হাতটা একটু ঘুরিয়েই জানাল। কেমন যেন একটা নির্বিকার ভাব। অন্যায় হলেও (বেচারী চাকরই তো) একটু রাগ হয়ে গেল ওর ঐ নির্লিপ্ততায়।

প্রশ্ন করলাম—"ম্যানেজার সাহেব কোথায় ?"

একটু যেন চাপতে চাইল বলে মনে হল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে বলল—"শাকাহারমে।"

ওটা নিরামিষের নূতন পরিভাষা হয়েছে। পাশেই। দোরটা খুলে প্রবেশ করলাম।

"কি চাই ?"

অফিস টেবিলটার দু' পাশে দু'জন ব'সে চেয়ারে ঘাড় উল্‌টে সিগারেট ফুঁকছিলেন, যিনি সামনাসামনি তিনিই প্রশ্ন করলেন আমায় দেখে।

বললাম—"আমিষ সেক্‌শনের ম্যানেজার আছেন এখানে ?"

"এই যে ইনি।

আমার দিকে পেছন ফিরে বসে ছিলেন, এতক্ষণে ঘাড়টা ওলটালেন উনি।

"কি দরকার ?"

"আমি এক প্লেট..."

"ও বেটা আপনাকে কিছু বলেনি ? তবে বসিয়ে এলাম কি করতে ?"

কোন ওয়েটার নেই। একটা চাকর···” কথা এগুতে দিচ্ছেন না। বললেন—“কি করতে থাকবে বলুন? ডিশ্ সার্ভ (Dish serve) করবে, এই তো কাজ ওদের? ডিশ্ আছে, ছেড়ে গেছে তারা, কিন্তু সার্ভ করবার একটু খুদ-কুঁড়োও নেই।

খুব আস্তে আস্তে আর সংযতভাবে কথাবার্তা, ভেতরে খুব বেশী-রকম রাগ বা বিরক্তি থাকলে যেমন হয়।

বললাম—“নেহাত একজনের যুগ্যি—সামান্য মাংস বা দু'টো ডিমই···”

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিকে, বললেন—“মাংস নেহাত যদি না ছাড়েন, কোম্পানী দোকান পেতেছে লাইসেন্স নিয়ে, দিতেই হবে খেতে—তা হলে দিতে পারি, হাত পা কেটে। ডিম তো পাড়তে পারব না, আমিও নয়, কোন বেটা ওয়েটারও নয়।”

হাতের সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে উঠে পড়লেন। দোরের কাছে গিয়ে ঘুরে বললেন—“আব পাগল বন্ জাউঙ্গা সাহেব।” (এবার পাগল হয়ে যাব মশায়)। আমাকে নয়, সঙ্গীকেই।

বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—“বাৎ কেয়া হ্যায় সাহেব?”

“বৈঠিয়ে।”—সিগারেট-চাপা আঙ্গুল দিয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন সঙ্গী-ভদ্রলোক, বললেন—“ভোজপুরী বারাৎ উৎরি থি।” (অর্থাৎ ভোজপুরী বরযাত্রী নেমেছিল)।

একটু সময় দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—“কুছ সমঝে?” (কিছু বুঝতে পারলেন?)

বুঝেছি বইকি খানিকটা। ভোজপুরী বরযাত্রী, এদিকে শূন্য ভাণ্ডার—একটা মানে তো দাঁড়াচ্ছেই। প্রশ্ন করলাম—“আপনার এখানেও ঢুকেছিল?”

“কেন ঢুকবে না বলুন?—পাব্লিক প্লেস।”

“এখানেও কিছু···”

“কেন মিছিমিছি আর লজ্জা দিচ্ছেন? থাকলে নিজে হতেই

বলতাম না? যখনই ওঁর খোঁজ করেছেন এসে তখনই বুঝে গেছি। তা ভিন্ন আপনার চেহারাতেও তো লেখা রয়েছে, কীরকম দরকার আপনার। কিন্তু কি করব? নিতান্ত নিরুপায় আমি।"

সত্যই নিতান্ত দীন অসহায় ভাব। হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে উঠে পড়লেন, বললেন—"না বিশ্বাস হয় দেখেই যান বরং।"

"না, অবিশ্বাস করব কেন? কি স্বার্থ মিছে কথা বলবার আপনার?"

"তবুও উঠুন একবার।"

ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাতটা বাড়াচ্ছিলেন। আমিই উঠে পড়লাম। আলমারি, ভাঁড়ার দেখিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন; সব শূন্য আর কেমন একটা ছন্ন-ছাড়া ভাব। বিশেষ করে রান্নাঘরটায়। উনুন দু'টো নেবানো, বাসনগুলো যেখানে-সেখানে যা তা ভাবে ছড়ানো, ঢুকতে একটা কাত করা বড় ডেকচি পায়ে ঠেকতে এক লাথিতে সেটাকে ঘরের ওদিকে পাঠিয়ে দিয়ে হাত দুটো চিত করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"দেখুন।"

"ঢুকে লুটপাট করে নিয়েছে নাকি?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

একটু ম্লান হেসে বললেন—"তা কখনও পারে? দেশে আইন রয়েছে তো। তেমনি ওদের দিকেও তো আইন রয়েছে।"

"কি?"—ভোজপুরী বরযাত্রীর জন্য বিশেষ কোন আইন মনে করেই প্রশ্ন করলাম আমি।

"লাইসেন্‌সড্ হোটেল, খেতে চাইলে খেতে দিতে হবে পয়সা দিলে।...আসুন শ্মশানদৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ দেখবেন? পেটে ক্ষিধে নিয়ে?"

বললাম—"হ্যাঁ, যাই একবার দেখি প্ল্যাটফর্মের দোকান বা ভেণ্ডারগুলোর কাছে যদি..."বেরুতে বেরুতেই বলছিলাম, উনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশ্ন করলেন—"দেখেছেন নাকি কোন ভেণ্ডার প্ল্যাটফর্মে!"

বেশ একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন। আমি একটু চোখ তুলে মনে

ক'রে নিয়ে বললাম—"অবশ্য, দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, তবে খোঁজও তো করিনি।"

"কাজ নেই—এই কাহিল শরীরের ওপর আর বৃথা মেহনত ক'রে। প্ল্যাটফর্মও তো একটুখানি নয়—Longest in the world। ও ভুল আর করতে যাবেন না। প্ল্যাটফর্মের সব জিনিস খেয়েছে—খাবারের দোকানগুলোর সব খাবার খেয়েছে; চিনে বাদাম, ছোলা-ভাজা, চিঁড়েভাজা, ঘুঘনি, হারা চানা (কাঁচা ছোলা), বেগুনি, ফুলুরি, গরম দুধ, মালাই, খোওয়া, রামদানাকা লাড্ডু; এদিকে চা, বিস্কুট, পাঁউরুটি সব বেবাক খেয়ে গিয়েছে, অবিশ্যি কিনেই। স্টেশনে একটি পান কি সিগারেট পর্যন্ত পাবেন না। This is the last smoke I am enjoying. (এই শেষ ধূমপান আমার আজ)... আসুন, বসুন।"

বসবার কথা নয়, কিন্তু কেমন যেন সব গুলিয়ে ফেলে, অন্যমনস্ক হয়েই বসে পড়লাম। যেন কিছু কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না; আমার অবস্থার কথা বলছিনা, সেটা তো সব কূলকিনারার বাইরেই, মনও নেই ওদিকে আর, বলছি ভোজপুরী বরিয়াতির কথা। কী কাণ্ড!

প্রশ্ন করলাম—"ক'জন ছিলেন?"

এক শ' সাতচল্লিশজন। একটা সিক্স-হুইলার গাড়ি রিজার্ভ করে ঘাট থেকে এল, সব চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে এই কয়েক মিনিট আগে গাড়িটা দ্বারভাঙ্গার দিকের ট্রেনে জুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"দ্বারভাঙ্গার দিকে।"

"চমকে উঠলেন কেন?"

ততক্ষণে সামলে উঠেছি। অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিলাম ব'লে একটু ঐ রকম হয়ে গেল। দ্বারভাঙ্গায় এমনিই মাছ নেই; ঘি নেই, দুধ নেই, চাল-গম রেশন। অবশ্য অত বড় শহর, "একটা বরযাত্রী গিয়ে আর কি ইতর-বিশেষ হবে?"—ঘরটার বাতাসে একটা আতঙ্ক ছেয়ে রয়েছে বলেই কথাটা অমনভাবে বেরিয়ে পড়ল। সামলে নিয়ে

সহজভাবে একটু হেসে বললাম—"না, চমকাবার কি আছে? এমনি জিগ্যেস করলাম। দ্বারভাঙ্গা থেকেই আসছি তো, অত বড় বরযাত্রী কার ওখানে আসছে—শুনে আসিনি তো, তাই জিগ্যেস করছি।"

বললেন—"অবিশ্যি, দ্বারভাঙ্গা শহরে নয়। শুনলাম আরও ওদিকে পাড়াগাঁয়ে কোন্ এক রাজপুত জমিদারের বরিয়াতি।...সমস্ত জেলাটাতেই তো শুনেছি একটা দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে, পাটনার কাগজগুলোয় তো প্রায়ই লিখছে..."

লজ্জিত হয়ে পড়েছি একটু। মনের হঠাৎ আতঙ্কটা ধরা পড়ে গেছে। হাসিটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"না, সে ভয় নেই। জমিদারের বাড়িই তো, থাক না কত খাবে।"

"থাক না কত খাবে!" কী বলছেন আপনি!"—এতক্ষণ যেন মিইয়ে ছিলেন, হঠাৎ, কেন জানি না একটু যেন উষ্ম হয়ে উঠলেন। "হাজীপুরে লোক পাঠিয়েছিলাম মশাই, কলার আড়ৎ। তা একটি খোলা পড়ে নেই। অথচ কতটুকুই বা পথ বলুন এখান থেকে—পুলটুকু পেরুলেই গাড়ি গিয়ে ঢুকবে ওখানে। আপনি বলছেন—থাক না কত খাবে? ধূলো পায়ে তো বিদায় করতে পারবে না মশায় তারা..."

লাস্ট স্মোকের টুকরোটুকু একবার দেখে নিয়ে নীচে ফেলে পা দিয়ে চেপে পিষে দিলেন—রাগের ইলেকট্রিসিটি খানিকটা যেন আর্থ (Earth) করে দিয়ে। প্রশ্ন করলেন "টিড্ডি কাকে বলে জানেন?"

—টিড্ডি হচ্ছে পঙ্গপাল। যেখান দিয়ে যাবে নিঃশেষ করতে করতে যাবে। উঠে পড়লাম, সান্ত্বনাচ্ছলে একটু হেসেই বললাম —"কি আর করবেন? আচ্ছা আসি।"

"সত্যিই তো, কি আর করতে পারি? বাজারে লোক পাঠিয়েছি —এত রাত্রে চালডাল মসলাটা পেতে পারে। আসুক, রাঁধিয়ে রাখছি ডালভাত—থাক কে কত খাবে...."

শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য ভোজনার্থীদের ওপর দিয়েই যেন গায়ের

আলোটা মিটিয়ে নিয়ে বললেন—"ঐ রেট কিন্তু আমার মশাই, এক পয়সা কম করব না। দোষটা আমার? বলুন।"

বেরিয়ে এলাম।

কোথায় গাড়ি।

প্ল্যাটফর্ম একেবারে ভোঁ-ভোঁ; এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত সোনপুরের সেই দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম। গাড়ি নেই, ভেণ্ডার নেই, যাত্রী নেই।

একটা কথা খুব সত্যি, তোমাদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানকেও মানতে হবে এটা। হয়তো মানেই, আমি জানিনে। কোন একটা অনুভূতি যখন কোন কারণে একেবারে চরমে ঠেলে উঠেছে, ভয়-জাতীয়ই বলো বা ভক্তি-বিশ্বাস-জাতীয়ই বলো তখন সেই অঙ্গের যে-কোন জিনিসই যেন সত্য রূপ ধরে ওঠে। বহু ক্ষেত্রেই লৌকিকের স্তরে অলৌকিকের আমদানি হয় এই করে। ভূত-প্রেত-মির‍্যাক্‌ল্‌ যাই ধরো না কেন। রাগ করলে উপায় নেই—ধর্ম ক্ষেত্রের অনেক উপলব্ধিও এই ধরনের।

বলবে, গোড়ায় আমি উল্টো ধরনের কথা বলে আরম্ভ করেছি—অলৌকিকের স্বপক্ষে ওকালতি করেই। বলেছি অনেক জিনিসই বিজ্ঞান-সূত্রে ধরা পড়ছে না। সে কথাও আবার ঠিক, আমি তো আমাদের সব উপলব্ধির কথা বলছি না। সীমার ওদিকে একটা অসীম রয়েছেই, থাকবেই চিরকাল।

চাঁদে রকেট পাঠিয়ে আমরা তার হাড়-হদ্দ জেনে নিচ্ছি, শুনেছি, নাকি জাম কেনবারও (আর সুধা নয়) হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু অসীমের তুলনায় চাঁদ তো এ-পাড়া ও-পাড়া। বলবে, জানবেই মানুষ একদিন—ধরবেই অসীমকে তার সীমিত জ্ঞানের বেড়া-জালে। প্রশ্ন করব—শেষ পর্যন্ত কবে? তার আয়ুও তো অসীম কালের মধ্যে দু'দিন। না, তোমার-আমার আয়ুর কথা বলছিনা, দুটো বুদ্‌বুদ, হতে না হতেই নিশ্চিহ্ন, তার আবার আয়ু! আমি বলছি সমগ্র মানব-জাতিটার কথাই। কতদিনই বা?

বলছে সৌরপতি সূর্যই থাকবেন না, তো মানুষ।

থাক এসব বড় বড় কথা। রহস্য-ভেদও হবে, আবার ভেদ হতে হতে থেকেও যাবে বহুত।

আমি বলছিলাম অনুভূতির চূড়ান্ত অবস্থার কথা, মনটা যখন খুবই High tension-এ, একেবারে চরম পর্যায়ে বাঁধা। নৈরাশ্য, সদ্যঃশ্রুত কাহিনী—প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি, তারপর গাড়িটার হঠাৎই অন্তর্ধান—সব মিলে সত্যিই মনে হলো একটা কিছু মির‍্যাক্‌ল্‌ বা ভোজবাজি হয়ে গেছে—ঐ এক গুণ বরযাত্রী দশ গুণ, হাজার গুণ হয়ে গিয়ে যাত্রী-গাড়ি-ইঞ্জিন স-ব…

অবশ্য নিতান্ত দু-চার মুহূর্তই—মনের বিভীষিকা বাইরে রূপ নিয়ে ওঠা; সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কঠিন বাস্তবে ফিরে এল। ভোজবাজি এত সহজ নয়, তার চেয়ে ঢের সহজ গাড়ির কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়া, বেহাইয়ের কাছ থেকে ড্রাইভার সাহেবের ছুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। বাঁশী কানে যায়নি? কিন্তু কান যা শুনছিল তাতে কোথায় একটু বাঁশী বাজল কি না বাজল সে খবর নেওয়ার মতো কি অবস্থা ছিল তার?

ভোজবাজি নয়। কঠিন, রূঢ় সত্য—গাড়ি ছেড়ে গেছে এবং তাতে আমার যাবতীয় মালপত্র, মায় পয়সাকড়িরও প্রায় সবটুকু। কি উপায়?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছি। একটা কুলি আসছিল, তাকে বললাম—"এখানে ঘাটের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, দেখেছ?"

লোকটা নেশা করেছে, চোখ নিচু করে প্ল্যাটফর্মের ধারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"কোথায়?"

যেন একটা নয়া পয়সা পড়ে গেছে, খুঁজে দিতে বলেছি।

প্ল্যাটফর্মের অন্য ধার দিয়ে একজন রেলে কর্মচারী যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরতে বললেন—ঠিক জানেন না, ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন।

আমাদেরটা হচ্ছে এক নম্বর। চলেই যাচ্ছিলেন, বললাম—"আমি বড় একটা বিপদে পড়েছি। আপনি তো স্টেশনের লোক দেখছি, একটু সাহায্য করতে হবে আমায়।"

সব কথা বললাম,যেতে যেতেই শুনছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় একবার নীচে থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন—"আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

এ-মুড়ো ও-মুড়ো দু দিকে লম্বা বারান্দার মাঝখানে স্টেশনের অফিসঘরগুলো, তার একটাতে নিয়ে গেলেন আমায়। বাইরের বোর্ডে লেখা দেখে বুঝলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের ঘর। তাঁর চেয়ারটা কিন্তু খালি। পাশে বসে আর একজন কাজ করছিলেন, তাঁকেই আমার কথাটা বলতে তিনি ওঁকে ঘাট স্টেশনে ফোন ক'রে জানিয়ে দিতে বললেন। একটু ব্যস্তই আছেন ভদ্রলোক।

ফোনে ওদিক থেকে খবর এল—গাড়ি এখনও পৌঁছায়নি।

ভদ্রলোক কলম থামিয়ে একটু বিস্মিতভাবেই বললেন—"সে কি! টু-সেভেনটিন আপ্ (217 up) তো অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে, প্রায় আধঘণ্টা হলো। রান্ (Run) তো মাত্র বারো মিনিটের এখন।"

আমি বললাম—"অত আগে ছাড়েনি।"

"ছাড়েনি কি? আমি গার্ড সাহেবকে নিজে লাইন ক্লিয়ার নিয়ে যেতে দেখলাম। হালদারবাবুর তো ডিউটি যাচ্ছে।"

"সে সময় ছাড়েনি।"—আমি বললাম।

"ছাড়েনি মানে?"

বৈবাহিক দুর্যোগের কথাটাই মুখে এসেছিল, বাদ দিয়ে বললাম—"ইঞ্জিনে কি একটা খুঁত এসে পড়েছিল..."

"ব্যস ইঞ্জিন ট্রাবল! কলমসুদ্ধ হাতটা চিতিয়ে বললেন—"লোকের এ-দোষ আর যাবে না! অথচ ওঁরাই সেকশানের বরপুত্র হ'য়ে ব'সে আছেন!..."

লোকো আর ট্রাফিকের চিরন্তন মনান্তর, জো পেয়ে ভদ্রলোক

কলম থামিয়ে ঝাল ঝাড়তে শুরু করতে আমি বললাম—তা হলে ?"

"তাহলে আর কি ? চুপ করে ব'সে থাকা ভিন্ন আর উপায় নেই। বুঝতেই তো পারছেন—খোঁড়া-নুলো ইঞ্জিন, আবার হাত-পা নিয়ে পড়েছে, ব্যাণ্ডেজ-পট্টি বেঁধে তবে তো আবার এগুবার চেষ্টা করবে।"

এমন নিগ্রহে মানুষ পড়ে ? অতি দুঃখে আমাদের মুখে যেকথাটা বেরিয়ে পড়ে সেটা যেন আপনিই পড়ল বেরিয়ে—"কী যাত্রা করেই যে বেরিয়েছিলাম !"

আর এটা তো অবচেতন মনে সবচেয়ে বড় কথা আজ থেকে থেকে মারছেই উঁকি।

"আচ্ছা, কোন অ্যাক্সিডেণ্ট তো হয়নি ?"—আমিই প্রশ্ন করলাম।

"তাহলে তো আপনার যাত্রা শুভই বলতে হবে, নয় কি ?"—উনিই একটু হেসে বললেন। যিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি চলে গেছেন নিজের কাজে।

একটু হেসেই বললাম—"তা ঠিক, যদিও এমন শুভযাত্রা কামনা করবার নয়। সে কথা নয়, আমি বলছিলাম—যদি তেমন কিছু হতো তাহলে না হয় চলে যেতাম—জিনিসপত্রগুলোও যদি—না হয় দেখিই এগিয়ে।"

খেয়াল হতেই মনের চঞ্চলতায় উঠেই পড়েছি, উনি লিখতে লিখতেই কথা কইছিলেন, কলমটা থামিয়ে বললেন—"আপনি বসুন স্থির হ'য়ে। অ্যাক্সিডেণ্ট নিশ্চয় নয় ; যতক্ষণ গেছে গাড়িটা, সে রকম কিছু হলে এতক্ষণে কেউ না কেউ এসেই পড়ত খবরটা নিয়ে।"

ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"হ্যালো··· পৌঁছেছে ?"

উত্তর হলো—পৌঁছায়নি এখনও।

উনি আমার দিকে ফিরে বললেন—"ঐ হয়েছে, ইঞ্জিন ট্রাবল

মাঝপথে।” আবার একটু হেসে বললেন—“অ্যাক্সিডেণ্ট কি এত সস্তা মনে করেছেন?”

মনে মনে বললাম—কী যে মাগ্নি আপনাদের লাইনে তাতো বুঝি না।

—“আচ্ছা, অন্য লাইনে চলে যায়নি তো গাড়ি?”

এ প্রশ্নটাও যেন আপনিই বের হয়ে গেল মুখ দিয়ে। আতঙ্কই তো ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। ভদ্রলোক এবার ঘাড় উল্টেই হেসে উঠলেন, হাত থেকে কলমটাও পড়ল খসে, বললেন—“বাবু সাহেব, ইঞ্জিন নিতান্তই সাদা জলই খায়, মদও নয়, গাঁজাও নয়।” হাসতে হাসতে কলমটা তুলে নিয়ে লিখতে লিখতে বললেন—“একটু স্থির হয়ে বসুন, এক্ষুনি এসে যাবে খবর।”

পারে কখনও লোকে? এত বড় একটা গোলমাল, একেবারে নিশ্চিন্ত, তার ওপর বিদ্রূপ—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। অধৈর্যের সঙ্গে বিরক্তি এসে পড়ে। উঠেই পড়েছি, একজন খালাসী কী একটা কাগজ নিয়ে এসে ঢুকল, পানি পাঁড়ে, কি ঐ ধরনের কেউ।

প্রশ্ন করলেন—“টু-সেভেনটিন আপটা কখন ছেড়ে গেছে জানিস?”

“ছাড়েনি তো এখনও।”

“ছাড়েনি!...ছাড়েনি কি?”—দুজনেই এক সঙ্গে প্রশ্ন ক’রে উঠলাম।

“না, ঐ তো রয়েছে দাঁড়িয়ে।”

“কোথায়?”

“যেখানে থাকে—এক নম্বরে।”

ভদ্রলোক নিঃসঙ্কোচ কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন একবার; যেন দেখে নিলেন, ইঞ্জিন যা পরিহার ক’রে চলে সে রকম কোন জিনিস সেবন করার কোন নিশানা আমার চোখে-মুখে আছে কিনা।

চেয়ার ঠেলে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এসে দেখি, সত্যিই গাড়িটা

রয়েছে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ, যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই। সত্যিই মাথার কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল নাকি? ভেবে ভেবে মাথাটা যেন আরও গেছে গুলিয়ে। যেতে যেতেই খেয়াল হলো হয়তো অন্য কোন গাড়ি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। ততক্ষণে গার্ডের গাড়ির কাছে এসে পড়েছি, দেখি সেই তিনিই আস্তে আস্তে পা-দানি থেকে নামছেন।

একটু থেমেই পড়লাম আমি; যদি ছেড়েও দেয় তো অন্তত ছুটে ওঁর গাড়িতেও উঠে পড়তে পারব এবার। আসল কথা চারিদিকে যে রকম ঠোক্কর খাচ্ছি, মনটা গুছিয়ে নিতে হবে। দাঁড়িয়ে বুকের নিশ্বাসটাও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলাম, তারপর বেশ সহজ—অনেকটা যেন নিরুদ্বেগ চালেই এগিয়ে গিয়ে বললাম—"তাহলে রেখেছিলেন ধরে? থ্যাংক্স!"

"এই যে এসে গেছেন। ধরে রাখা মানে! কমলি ছাড়বে তবে তো যাব।"

"ছাড়েনি বেহাই এখনও?"—হেসেই বললাম।

"তিনি ছেড়েছেন বৈকি, নইলে সেকেণ্ড লাইনে এল কে?"

একেবারেই খেয়াল হয়নি ওদিকটা; একে রাত্রি, তায় গঙ্গার ওপারের মতো লাইনও চওড়া নয়, চোখে পড়েনি, মনের অবস্থাও তো সেইরকমই। উনি বলতে লক্ষ্য করে দেখে বুঝতে পারলাম আমার মাথাও ঠিক ছিল এবং কোন ভোজবাজিও হয়নি, গাড়িটা প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে সরে পাশেই দ্বিতীয় লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারখানা কি!

বিমূঢ় ভাবটা লক্ষ্য করে বললেন—"বুঝলেন না—গরীব গেরস্তর সংসার যে, ফালতু ব্যবস্থা তো নেই।"

আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন—"আপনার বাড়িতে চারখানি ঘর—একটি রান্নার, একটি ভাঁড়ার আর ঠাকুরের, দুটি শোবার; একটিতে স্ত্রী-পুরুষে শোন, একটিতে ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ কুটুম এল

—যেমন ড্রাইভার সাহেবের বেহাই এসেছে আজ, কিংবা ধরুন কোন অতিথি ; কি করবেন ?"

বললাম—"ভাঁড়ারে নিজেদের ব্যবস্থা করে একটা ঘর ছেড়ে দিতে হবে।"

"এও তাই !; গেরস্ত রেল, ঠিক মাপাজোকা ব্যবস্থা, যদি একটা ফালতু গাড়ি এল কিংবা যেগুলো রোজকার সেগুলোরও টাইম একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেল—আর নিত্যিই তো হচ্ছে—তা হলেই চক্ষু চড়ক গাছ !…বেহাইয়ের আদর অভ্যর্থনা সেরে ড্রাইভার সাহেব এসে গিয়ে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়েছে, আমিও মুখে হুইসিল দিয়ে আপনার কথা মনে পড়ে একটু থমকে গেছি, এমন সময় হাত তুলে ছুটতে ছুটতে একজন এসে উপস্থিত—'এখন গাড়ি ছাড়বে না।'…'কি ব্যাপার ?' না। 'ইসপিশাল আতা হ্যায়'।…গোরক্ষপুর থেকে হোমরা চোমরাদের একটা স্পেশ্যাল ঘাটের দিকে গিয়েছিল—জল ক'মে আসছে, গঙ্গা ট্রাবল দিচ্ছে তো সেই তদারকে ; সেইটে ফিরছে। 'যথা-আজ্ঞা' ব'লে গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছি ; লুকবো না স্যার, একটু তন্দ্রাও এসে গেছে, চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ি চলছে !…কি ব্যাপার মশাই। না, পাশে সেকেণ্ড লাইনে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি ; আর লাইন খাল্লি নেই। বুঝলেন না ? অন্য লাইনের গাড়ি সব এসে পড়ছে তো, কোন কোনটা গেছেও এসে। বাপ-মা মরা ঘাটের গাড়ি ; ঝোঁকটা তার ওপর এসেই পড়বে তো…তারপর ? রিফ্রেশমেণ্ট রুমের কি খবর ? জুটল কিছু কপালে ?"

মালপত্রগুলোর দিকে মনটা গিয়ে পড়েছে, আর কথা না বাড়িয়ে বললাম—"সে একরকম না জোটার মতই, পিত্তিরক্ষাটা হলো কোন রকমে।....আচ্ছা আসি।" পা চালিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

হেঁকে বললেন—"এবার থেকে পাঁজিটা দেখে বের হবেন দয়া ক'রে। মনের জোর আমিও দেখিয়েছি এক সময়—কিছু নয় স্যার। শুধু ওঁদের চটিয়ে তোলা।"

সত্যিই যেন চটিয়ে তুলেছি।

"স্টীমারটা ছেড়ে গেছে?"—ঘাটে পৌঁছেই আমার নিতান্ত উদ্বিগ্ন প্রশ্নটার উত্তরে কুলি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল—"এখনও আসেইনি স্টীমার।"

—"আসেনি কি! গাড়িই তো প্রায় তিন ঘণ্টা লেট। কখন আসবে?"

মোট নামিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—"বোলিয়ে।"

ঘাট-কুলিদের মুখের বুলি ওটা, অর্থ—কত দেবেন আগে বলুন। খুব দাঁওয়ে পায় তো যাত্রীদের। আর ঐ পদ্ধতি। ঐ যে ছুঁয়ে দিল তোমার মোট, অন্য কুলি আর ঘুরেও চাইবে না। অলিখিত ট্রেড ইউনিয়নিজম, কিন্তু সাধ্য কি কোন কুলি খেলাপ করে।

একটু বচসা হয়ই, কিন্তু আজ সে উৎসাহ একেবারেই নেই। কিন্তু জানই তো যেখানে একেবারে নিরুপায়, মন সেখানে অন্তত আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়ার একটা পথ না বের করে স্বস্তি পায় না; তা যতই দুর্বল বা নিরীহ হোক। সাহিত্যিক মানুষ, আমি আমাদের যা সব-চেয়ে বড় অস্ত্র অর্থাৎ আমরা যেমন মনে করি, সেই শ্লেষের আশ্রয় নিলাম, প্রশ্ন করলাম, "কত চাস তুই?—চার টাকা—ছ টাকা—না, তাও কম হচ্ছে?"

কেন জানি না, হেসে ফেলল। তারপর হাত জোড় করে বলল—"রাগ করছেন! আমরা গরীব, আপনি হচ্ছেন রাজা আদমি…ছ টাকা কেন, আট টাকা দিলেও আপনাদের—"

কড়ির সঙ্গে কোমলও মেলায় কখনও কখনও।

প্রশ্ন করলাম—"কত চাস তুই বলবি তো?"

তর্জনীটা তুলে ধরে বলল—"এই বড়বাবু, পুরোপুরি। আপনি মেহনতটা দেখে ইচ্ছে হয় দেবেন, না হয় একটা লাথি ঝেড়ে বলবেন—বেরো ব্যাটা, কিচ্ছু পাবি না।…একবার ভিড়টা দেখে নিন।…নিন, একটু আলগে দিন।"

আশ্চর্য হচ্ছ নিশ্চয়, এই হঠাৎ আমুল পরিবর্তনে। আমিও হয়েছিলাম, রহস্যটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল সদ্য সদ্য। মোটটা তুলে দিতে যাব, ও পাশের মাটি থেকে একটা পরিষ্কার ইস্তিরি করা গান্ধী টুপি তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, বলল—"নিন, হুজুর, আপনার টুপিটা পড়ে গেছে নীচে।"

কার টুপি নামবার সময় ঠেলাঠেলিতে পড়ে গেছে, টের পায়নি। আমারও নজরে পড়েনি। আমাদের গাড়িটার পাশেই একটা লম্বা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার জন্যে জায়গাটা একটা অন্ধকার গলির মতো হয়ে গেছে। তার ওপর চাপ ভিড়।

কিন্তু তুমি যা হয়ত ভাবছ তা নয়। গান্ধী টুপি দেখেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অহিংস হয়ে গেছে মনে করছ তো? মোটেই নয়।

কাউন্সিল ব'লে একটা বস্তু আছে জান নিশ্চয়। রাজ্যের উর্ধ্বতন নিয়ামক। এমনি সাড়া যদি নাই পাও তো যখন তর্ক-বিতর্কের হিংস্রতায়, চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়িতে সেখানে গান্ধীজীরও টনক নড়ে তখন খানিকটা আওয়াজ তোমার কানেও নিশ্চয় পৌঁছায়ই। কাউন্সিলে কথা ওঠাটা ইংরেজদের আমলে ইংরেজরাও ভয় করত; এখনও ধারাবাহিকতাটা চলে আসছে; বিশেষ করে যাদের গলদ বেশী তাদের মধ্যে। রেলের স্থান এ বিষয়ে তো একরকম বলতে গেলে সর্বাগ্রে; ভয় পায় একেবারে ওপরের মাতব্বরের দল থেকে নীচের কুলি পয়েন্টসম্যান পর্যন্ত সবাই।

কোনও কাউন্সিলারের মাথা থেকেই যে খ'সে পড়েছে এমন কোন স্থিরতা নেই। তবু ভয় করে, সাবধানই থাকে, বিশেষ ক'রে এই ধরনের পাতলা শৌখীন ছাঁটের টুপি দেখলে। এখন নাকি আবার কাউন্সিলের বৈঠক চলছে, আনাগোনা চলছে সদস্যদের।

নিয়ে নিলাম হাতে কিছু না বলে। মহাপুরুষের প্রতীকটুকু অবলম্বন ক'রে যদি এই দুরতিক্রম্য যাত্রাপথ শেষ করা যায় তো মন্দ কি? তারপর গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে দিলেই হবে।

না, ওর মর্যাদা রক্ষা করবার লোক যে একেবারে নেই দেশে এ কথা বলছি না। তবু মনে হয় এবার মিনিস্ট্রির গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেই যেন ভালো। অল্প প্রভাব যেটুকু এখনও রয়েছে তাতে বরং বলতে পারব সজ্ঞানেই গঙ্গালাভ হয়েছে। এতবার পারাপার করেছি গঙ্গা, এখানেও আবার কলকাতা যাওয়ার পথে মোকামাঘাটেও কিন্তু এ রকম চাপ ভিড়ের মধ্যে পড়িনি। হবে না কেন, ষ্টীমার অসম্ভব রকম লেট, দু'খানা গাড়ির লোক জড়ো হয়েছে, তার ওপর পূর্ণিমার স্নানার্থী রয়েছে। তুমি বলবে কোজাগরী পূর্ণিমা তো স্নানের পূর্ণিমা। তুমি বোধ হয় জান না পুণ্যার্থীদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক যারা তিথির জোরে দেব-দেবীদের কাছ থেকে পুণ্য আদায় করে। অমুক তিথিতে অমুক যোগ রয়েছে, অমুক ধরনের কাজ করলে এত পুণ্য হবে—যেমন ধরো অক্ষয় স্বর্গ বা চুরি-বাটপাড়ি, ব্রহ্মহত্যা গো হত্যা জাতীয় পাপের জন্য যতখানি দরকার হয় আমি সেই তিথিতে সেই কাজ করলাম, সুতরাং খাতায় আমার নামে সেই পরিমাণ পুণ্য যেন জমা থাকে। খোশামোদ নয়, এক ধরনের লাঠির জোরে পুণ্যি আদায় বলতে পারো। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্যার্থী করে স্পেকুলেশন (Speculation)। রাতটি মা-লক্ষ্মীর নামে, তার ওপর পূর্ণিমাই তো, তুমিও মা গঙ্গা, দুটো ডুব দিয়ে দিচ্ছি, স্নান-যোগ থাক বা না থাক, দিও কিছু হাত তুলে। স্পেকুলেশন মানেই তো দৈব-নির্ভর, এও তাই। ওদিকে গিয়ে কি হলো, শেষ পর্যন্ত কারা বাজিমাত করল, কে আর দেখতে যাচ্ছে বলো?

ভীষণ ভিড়। ঘাটের মুখটা দু'শ গজও হবে কিনা সন্দেহ, ভিড় চিরে পৌঁছাতে যেন মাইল দুয়েকের মেহনত হয়ে গেল। তাও যে ঠিক মুখের কাছে এসে পড়েছি, এ কথাও তো বলতে পারছি না। কুলি আমায় একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এনে হাজির করেছে। স্টীমার জেটিতে থাকলে বোঝা যেত ; এখন খালি জেটিটা যে কোথায়, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। মোট নামিয়ে, মাথার

পাগড়িটা খুলে মুখ-হাতের ঘাম মুছতে মুছতে কুলিটা বলল,—"দেখুন হুজুর, কি রকম মেহনতের কাজ আমাদের। অথচ আপনারা 'কৌসিলে' হল্লা করবেন, হারামজাদারা ফাঁকি দিয়ে জবরদস্তি পয়সা আদায় করে; ওপর থেকে হুমকি আসবে, রেট নিয়ে কড়াকড়ি হবে।"

তা হলে দেখছি টুপির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আন্দাজটা আমার ভুল হয়নি।

বললাম—"তোরা বাগে পেলে যে না করিস এমন তো নয়, তুই না-হয় আমার বেলায় না করেছিস। যাক্, সে কথা। তুই এক কাজ কর, একটু স্টেশনের দিকে গিয়ে সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা কর, স্টীমার কত দূর, কী ব্যাপার, আজ রাত্তিরে আসবে কিনা। আমি খুঁজে বের করতেও পারব না স্টেশন, পারলেও ফিরে আসা মুশকিল হবে।"

ও চলে গেল। বিপদ আর এক রূপ ধরে এসে দেখা দিল।

আর ফিরে আসে না লোকটা। ঘড়ি দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল—চল্লিশ মিনিট, পঁয়তাল্লিশ, দেখা নেই। স্টীমারের ভাবনা লোপ পেয়েছে, উলটে ভয় হচ্ছে সেটা এসে না পড়ে। এ মোটঘাট নিয়ে যে এক পা নড়বার উপায় নেই। ভরসামাত্র কাউন্-সিলের টুপি। কিন্তু সেটা ওর না হয় কিছু কিছু ভয়, সত্যি বলতে গেলে আমার তো কোন ভরসাও নয়।

এল শেষ পর্যন্ত। দুটি দুসংবাদ বহন করে। স্টীমারের বিশেষ কোন আশা নেই। ব্যাপার গুরুতর। স্টীমার আসতে আসতে মাঝপথে চড়ায় আটকে গেছে। তাকে টেনে নড়াবার জন্যে ওপার থেকে একটা স্টীমার পাঠানো হয়েছে, খবর এখানে এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তারপর কি অবস্থা কেউ বলতে পারছে না। নানারকম গুজব উঠেছে, কেউ বলছে চড়ায় ফাঁসেনি, ডুবেই গেছে স্টীমারটা। কেউ বলছে টানাটানিতে দু'-আধখানা হয়ে যায়

স্টীমারটা, আধখানাকেই খানিকদূর টেনে নিয়ে আসবার পর এ স্টীমারের সারেঙের হুঁশ হয়....

"ঠিকই তো কিয়া।"

ঘুরে দেখি কুলির কাহিনীতে কয়েকজন যে এগিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে তিলককাটা বড় পাগড়িধারী একজন পণ্ডিতের মন্তব্য। একটু ধাঁধায় পড়ে যেতে হল বৈকি! স্টীমারের আধখানা টেনে নিয়ে চলে আসছে সারং এটুকু পরিপাক করাই তো যথেষ্ট দুরূহ, সেটাকে আবার অনুমোদন করে কি ভেবে!

প্রশ্ন করতেই হলো—"ও কথা বললেন যে আপনি পণ্ডিতজী!"

"সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" —হাতে নস্য ছিল, শেষের বিসর্গটায় খুব জোর দিয়ে, নাকে ঠুসে দিয়ে সশব্দে হাত ঝেড়ে বলল—"গীতামে ভগবাননে কহা হ্যায়।"

নস্য-সজল বড় বড় চোখে একবার চেয়ে নিল সবার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে।...হয়ত কোন স্নানার্থীদলকে পুণ্য অর্জনে সহায়তা করতে এসেছে মন্ত্র-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে।

কুলি এসে আর একটি যে দুঃসংবাদ দিল তা এই যে, ইতিমধ্যে ওপারের যাত্রিবাহী আর একখানি গাড়ি সোনপুর থেকে উপস্থিত হয়েছে। বুঝলাম এই যে এতখানি দেরি হলো ওর, সেটা এইজন্যেই। আরও যাত্রী ধরেছে, তাদের মোটঘাটসুদ্ধ কোথাও বসিয়ে এসেছে।

এ আর এক বিপদ। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষমাস। এরকম দুর্ঘট ওদের কামাবার মরশুম। প্রত্যেক ট্রেন থেকে যাত্রী নামিয়ে বসিয়ে বসিয়ে এসেছে। তিনখানা ট্রেন, আশ্চর্য হব না যদি কোনটা থেকে একাধিক যাত্রী বা যাত্রিদল নামিয়ে বসিয়ে এসে থাকে। তারপর এক এক করে তুলবে, এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে! আমার পালাটা কখন? আগে একখানা গাড়ি এসে গিয়েছিল। সোজাই পাড়তে হলো কথাটা—"তুই তা হলে এই গাড়ির লোক নামাতে গিয়েছিলি?"

একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ হুজুর, মিছে কথা বলব না। দু' পয়সা পাই, একটু মেহনত করি।"

"তাদের মোটও তুলে দিবি তো জাহাজে ?"

"এরা স্নান করতে এসেছে হুজুর। ওপারে যাবে না।"

"ঠিক তো ?"

"বিলকুল ঠিক হুজুর, মিথ্যে বলতে পারি আপনাকে ?" —জিভ কেটে কানে হাত দিল।

"আমার আগেও তো একটা গাড়ি এসেছে।"

আরও থতমত খেয়ে গেল। চেয়ে রইল মুখের দিকে। ধরা পড়ে গেছে।

"তাদের মোট তো আমার আগেই তুলে দিয়ে আসতে যাবি ?"

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে গান্ধী টুপিটাও বের করে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতের চেটোটার ওপর আস্তে আস্তে আছড়াতে লাগলাম।

একেবারে আধখানা জিভ বের করে দাঁতে চাপল। বলল—"তা কখনও পারি হুজুর ? আপনি হচ্ছেন..."

কি হচ্ছি আমি সেটা আর বলল না। তবে দৃষ্টিটা তেরছা হয়ে টুপিটার ওপর গিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "নম্বরটা দেখা তো ?"

পকেট থেকে পেতলের তকমাটা হাতে দিতে আসছিল, বললাম —"নিয়ে করব কি ? তুই নড়বিনি এখান থেকে। খবরদার।"

আরও আধ ঘণ্টা কাটল, যার প্রত্যেকটি মিনিট যেন এক একটি কল্প। এদিকে যা'হক একটা অবস্থার মধ্যে থিতিয়ে বসতে, শরীর তার যত দাবি-দাওয়া এনে একসঙ্গে উপস্থিত করল। অসহ্য ক্ষিদে, তার সঙ্গে অসহ্য ক্লান্তি আর অবসাদে চোখের পাতা যেন বিশমণ ভারী হয়ে এসেছে। পাশেই একটি ছোট যাত্রিদল, মেয়ে-পুরুষ-কচি-কাচা নিয়ে পাঁচজন। পুঁটুলি খুলে স্ত্রীলোকটি চাটুর মতন বড়, হাতের

ভেলোর মতন পুরু দু'খানা সাদা ধপধপে মকাইয়ের রুটি বের করেছে। নিশ্চয়ই সঙ্গাইয়ের। খানিকটা ধুঁধুলের তরকারি, দু'টো বড় বড় আমের আচার। খানিকটা ভেঙে দেয় না গঙ্গার তীরে দান করে পুণ্য অর্জন করেছে বলে? না, চাইছি না, প্রাণান্তেও চাইব না নিশ্চয়। কিন্তু দিলে যে না বলব না এটাও সমানভাবেই নিশ্চয়। আমি চাওয়া আর স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আবিষ্কার করে ফেলেছি। চাওয়া ভিক্ষা, না চেয়ে পাওয়া দান। আরও একটা জিনিস—অবশ্য আমার আবিষ্কার নয়, নূতন কথাও নয়—সাম্যবাদ। এ তত্ত্বকে এত প্রত্যক্ষভাবে, এত মনে-প্রাণে পূর্বে কখনও মেনে নিয়েছি বলে মনে পড়ছে না। রাজার দান নিয়েছি, গৌরব মনে করেই। আমি কি একাই? পুরুষানুক্রমে সে দানের গৌরব বহন করে এসেছে আমার ধমনীর রক্ত। ব্রাহ্মণই তো। আজ সাম্যের যুগ। খাদ্যের আর বেশভূষার সামান্যতা দেখে মনে হয়, এরা হয়তো আমার কুলির শ্রেণীরই মানুষ; কিন্তু আমি প্রভেদ সৃষ্টি করতে যাই কেন, এই গঙ্গার তীরে? ভেঙে ভেঙে দিল সবাইকে। রুটি, ধুঁধুলের তরকারি, আচার। পুরুষটাকে আধখানা দিয়ে বলছে—"আরও খানিকটা দিই?" উত্তর হলো, না, দরকার নেই।...কী ক'রে বলতে পারে লোকে এ কথা! কচি দুটোকে যা দিল তা ওরা খেতেই পারবে না। অন্তত পারা উচিত নয়।

মাগী নিজে গোটা আধখানা রুটি, এক খামচা তরকারি, গোটা একখানা আচার নিয়ে একটু ঘুরে বসল। "মাগী" কথাটাই তখন মনে এসেছিল, কলমের ডগায় তাই আপনিই বেরিয়ে গেল এখন। "মহিলা"-ই মনে আসা উচিত ছিল তো—সাম্যযুগের মন।

মনে পড়ে গেছে! পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা! আমি ক্ষুধায় পতিত আজ। পড়া অর্থাৎ কবলিত অর্থেই "পতিত" নয়, সে তো আছেই। নীচে নেমে যাওয়া অর্থেও 'পতিত' নয় কি? নেমে যায় নি কি মনটা? নইলে ভিক্ষা আর দানের এত সূক্ষ্ম প্রভেদ করলাম কি করে আবিষ্কার?

কুলিটাকে ব্যাগ থেকে ঘটিটা বের করে দিয়ে বললাম—"নদীর ভেতর দিকে খানিকটা চলে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে আসতে পারিস? দেখিস্ যেন কাদাবালি না থাকে।"

—থাকলেই বা ক্ষতি কি? জলের সঙ্গে আহার।

লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে খেয়াল হলো—অর্থাৎ পালিয়েও তো যেতে পারে। এবার তো উলটে লাভই থাকবে। ভালো কাঁসার ঘটি, ভাড়ার টাকাটা বাদ দিয়েও কেন না আরও টাকা পাঁচেক হাতে থাকবে? তকমাটা চেয়ে নেওয়া হলো না।

যাক্, লাভ-বঞ্চনার সব হিসেব যাক চুকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও। আমায় শুধু একটু নিদ্রার জায়গা দাও মা তোমার তীরে। শেষ নিদ্রা হয় তো আরও ভালো।

ফিরেই এল লোকটা। কাঁধ উলটে সমস্ত জলটা গলায় ঢকঢক করে ঢেলে দিলাম। আমার গোত্র-পিতা ছিলেন ভরদ্বাজ মুনি; জহ্নু-মুনির সঙ্গেও কি কোন সম্বন্ধ আছে আমার?

বালির ওপর বিছানাটা আধ-পাতা করিয়ে শুয়েছি।

অপরকে সন্তুষ্ট করবার একটা প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে নিজের তরফের লোকের নিন্দা করা। তাতে মনে হয় কত না আপন করে দিলাম নিজেকে। আত্মীয়ের চেয়ে ঘর-ভাঙ্গানে বিভীষণ আবার বেশী আত্মীয় কিনা।

আগে জমিটা ঠিক করে নিল, একবার জিজ্ঞেস করল, আমি কোন্ দিকের মানুষ—এই পাটনা-ছাপরার দিকের, না, দ্বারভাঙ্গা-মোকামার দিকের। তারপর আরম্ভ করল—"জানেন হুজুর, এই যে চড়ায় জাহাজ আটকানো, এটা একেবারে বাজে কথা।"

"আটকায়নি! তা হলে! আছে কোথায়?"

"না, আছে তো আটকেই। নিত্যিই আটকাচ্ছে; কাল প্রায় সমস্ত দিনটা ছিল আটকে একটা স্টীমার। কিন্তু আপ্‌সে যে আটকে যাচ্ছে তা তো নয়। এই গঙ্গাজীই চিরকাল রয়েছেন, জল কমে চড়া

পড়েছে সেও আজ নয়, এই সারেঙরাই বহু দিন থেকে কাজ করছে, কোথায় জল কোথায় চড়া ওদের নখদর্পণে—কথায় কথায় জাহাজ আটকে যাওয়া এত সহজ নয়। ভেতরকার কথাটা অন্যরকম…"

চোখ বুজে আসছে, তবু কৌতূহলের আতিশয্যে ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি রকম?"

"ঐ যে গঙ্গাজীর ওপর পুল বাঁধবার কথা হচ্ছে না? ওটা আপনাদের দিকেই, মানে মোকামাতে হলেই তো ভালো। নেহরুজী, রাষ্ট্রপতি, এঁরাও তাই চান—ওঁদের কাছে যেমন মোকামা তেমনি পাটনা তো—কিন্তু পাটনার লোকেদের ইচ্ছেটা অন্যরকম—তারা চায় পাটনাতেই হোক ওটা, পাটনার লোকেদেরই বেশী বোল-বোলাও তো, পাটনা হলো রাজধানী—কিন্তু শুনছি তা তো আর হচ্ছে না—তাই একটা হৈচৈ করে নিজেদের মকদ্দমাটা 'ইস্ট্রাং' করবার জন্যে সারেঙদের সঙ্গে সড় করে…"

ভিড়ের শব্দের সঙ্গে এই "মকদ্দমা স্ট্রং" করার কাহিনী মৌমাছির গুনগুনানির মতন কখন মিলিয়ে গেছে কানে, যেন ঠিক তার পরেই আমার কাঁধটা ধরে ওর বেশ ঝাঁকুনি দিয়েই ডাক—"হুজুর, উঠুন উঠুন, জাহাজ দেখা দিয়েছে!"

"জাহাজ!"—ধড়মড়িয়ে একেবারে সোজা হয়ে বসেছি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গায়, যেন ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি এই-ভাবে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কোথায়?"

দাঁড়িয়েই ঝুঁকে পড়ে আমায় নাড়া দিয়ে তুলেছে, সোজা হয়ে ডান দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—"ঐ যে!…ঐ নিন, বাঁশীও দিচ্ছে।"

দাঁড়িয়ে উঠে তর্জনী সঙ্কেত অনুসরণ করে কিছু তো দেখতে পেলাম না। মনটা গুছিয়ে নিতে পারছি না তো।…তারপর অতি ক্ষীণ একটা বাঁশীর আওয়াজ, এক ঝলক আলোয় মনটা যেন আস্তে আস্তে স্বচ্ছ হয়ে এল। হ্যাঁ, এটা একটা আলোক-বিন্দুই

যো। স্টীমারের সার্চলাইট না? বাঁশীর চেয়ে আরও কত ক্ষীণ কিন্তু!

কিন্তু একি ভীষণ দৃশ্য!

কোজাগরী পূর্ণিমার সে আকাশ কোথায়? হাতঘড়িতে দেখলাম দুটো দশ। তার মানে ঘণ্টাখানেকের ওপর ঘুমিয়েছি আমি। চাঁদটা একেবারে নীচে দিকচক্রের কাছাকাছি নেমে গিয়ে হেমন্তের কুয়াশায় চারিদিক গেছে অস্পষ্ট হয়ে। কেমন যেন অস্বস্তিকর; ভয়াবহ বললেও বোধ হয় দোষ হয় না। চাঁদ আর দেখা যাচ্ছে না। হয়তো পুবের ঘনীভূত কুয়াশাই, কিংবা হতে পারে একটা খুব পাতলা মেঘের পেছনে তার বৃত্তরেখা বিলুপ্ত। যেন মৃতের স্মৃতির মতন শুধু একটা গোল আভা। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি গঙ্গার ওপর সেই আলোটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা আগুনের ভাঁটা একটা দৈত্য যেন, তার একটিমাত্র চক্ষু কপালের মাঝখানে জেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

আর সেই বাঁশী!

দৃষ্টিটা তীরে চলে এল। একটা বিরাট জনসংঘ। সবাই এখন শুয়ে-বসে; নিদ্রিতই বেশী, তাই তার ঘন-নিবদ্ধ আকারটা দেখতে পাচ্ছি যেন, তবে কত দূর পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অন্ধকার-লিপ্ত গাঢ় কুয়াশায় প্রান্তভাগ মুছে মুছে গেছে। বাঁশীর স্বর যতই স্পষ্ট হয়ে আসছে, চকিত হয়ে মাথা তুলছে—এখানে, ওখানে। সেদিন প্রায় স্তব্ধ সেই গভীর রাত্রে মুক্ত তট-প্রান্তরে হঠাৎ জেগে ওঠার বিস্ময়ে সে যে এক বিভীষিকা দেখি—ভীষণ মোহনই বলি—তার জুড়ি আর চোখে পড়েনি জীবনে। মনে হলো জনসংঘ নয়, কার বাঁশীর ডাকে এক বিপুল বিরাট সহস্রশীর্ষ ফণীর সুপ্তি যাচ্ছে ভেঙে, একটি দুটি করে ফণা জেগে উঠে বাতাসে দোল খাচ্ছে।

সব জড়িয়ে এক হয়ে গিয়ে অনির্বচনীয় সে যে কী একটা অভিনয়

প্রকৃতির উন্মুক্ত নাটমঞ্চে তা কি করে বোঝাই তোমায় ?……অভঙ্গ শান্তি, একটি মাত্র ধ্বনি, তাও বাঁশীর ধ্বনি, পূর্ণগঙ্গা, কোজাগরী পূর্ণিমা ; তারই সঙ্গে ঘনায়মান, আঁধার-ছোঁওয়া কুহেলী, মাঝখানে ঐ অগ্নিপিণ্ড, ক্রমেই বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসছে ; সর্বোপরি এই রহস্যকায় জনতা-সরীসৃপ।

শুধু সুন্দরই কি মনোহর ? যা ভয়ঙ্কর, যা বীভৎস তাও কি নয়? দুটোই যখন এক হয়ে গেছে—সে আবার কী উদ্ভ্রান্তির মনোহর একবার ভেবে দেখ না। হৃতমন আমি নিশ্চল, নির্নিমেষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কুলিটা বোধ হয় একবার ঢুকেছে, সাড়া না পেয়েই আঙুল দিয়ে কাঁধটা একটু চেপে বলল—"হুজুর, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ভিড় ঠেলে যতটা সম্ভব এগিয়ে জেটির কাছাকাছি জায়গা নিতে হবে। তিনটে জাহাজের লোক।"

হ্যাঁ, এগিয়ে যেতে হবে বইকি। জীবন তো স্থাণু নয়, একটা ক্লাইমেক্সের দিকে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে ; সে ক্লাইমেক্স মৃত্যুই।

মৃত্যুই।....আর বইছে না শরীর

সবটাই শোনাতে হবে ?

কিন্তু যখন সব অসাড় হয়ে এসেছে, অনুভূতি প্রায় লুপ্ত, স্মৃতি আচ্ছন্ন তখনকার ইতিহাস কি করে বলি ?

এগিয়েছিলাম কি ভিড়ই আমায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শম্বুক গতিতে ?

পঞ্চাশ গজও বোধ হয় নয়, যখন দাঁড়িয়ে পড়ি, ঘড়িতে দেখি প্রায় আড়াইটে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেছে। জাহাজ এসে পৌছাতে, যাত্রী খালাস হতে লাগল ঘড়ির কাঁটা ধরে আরও দেড় ঘণ্টা। একটা অস্ত্রহীন নীরব যুদ্ধ—ওরা নামবে, জাহাজে আতঙ্ক ধরে গেছে ; এরা উঠবে, নিষ্পেষণ করে ফেলতে চাইছে পরস্পরকে। পুলিস ? কী করবে ? সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য।

……কী করে পৌঁছলাম মনে নেই, শুধু একটা প্রার্থনা মনে আছে—যেন পুলটা ভেঙে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাই। অযাত্রায় যাত্রা করে অপরাধ করেছি ? এইটেই সে অপরাধের ক্ষমা বলে মনে করব, হে দেব।

জাহাজটা যাত্রিবাহী নয়, প্রকাণ্ড এক মালবাহী জাহাজ, বোধ হয় হোরমিলার কোম্পানীর কাছ থেকে আমদানি করেছে ওরা। এত দূরদর্শিতার কাজ ওরা আর কখনও করে নি। মানুষ নিঃসাড়, নির্জীব মালের গাদাই হয়ে গেছে অযুত সংখ্যায়। ……সেকেণ্ড ক্লাস ওপরে……অসম্ভব ওঠা। কুলি আমায় নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া বেরুবার চিমনির কাছে একটা ঘেরাঘুরি জায়গায় বসিয়ে দিলে—মোটঘাট দিয়ে সামনে একটা আগলও করে দিলে কোনরকম বসবার মতন একটু জায়গা রেখে।……বলছে, কাউন্সিলের মেম্বার আমি, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী—যেন একটু খাতির রাখে……

মৃত্যুর আগে কি সত্যমিথ্যার অতীত হয়ে যাই আমরা ? তীরে মিথ্যাভাষকে প্রশ্রয় দিয়েছি, এখন তা যখন পূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করল, তখন একটু প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই।……শেষ মনে পড়ছে—এক টাকাটাকে দু'টাকা করে ওর গঙ্গা তীরের ঋণ শোধ করে দিতে পেরেছিলাম।

আরও বলতে হবে

ঘুমিয়েছিলাম, কি জেগে ছিলাম তা তো জানি না। দুঃখ যখন এসে পড়ে চরমে তখন মানুষ থাকে জীবন্মৃত। নিদ্রাজাগৃতির মাঝখানে রহস্যলোকে, তার বর্ণনা যে কেউ দিয়ে যেতে পারে নি। সেই নিষ্করুণ রহস্যলোকের মধ্যে ছিল আমার শেষ যাত্রা।

তারই মধ্যে দিয়ে আমার সমস্ত দেহ-মন অন্তরাত্মা হঠাৎ এ কি এক আনন্দলোকে বিকশিত হয়ে উঠল !

নবোত্থিত পাখিদের কাকলিতে চোখ মেলে দেখি সামনে এক

নূতন দিনের সূর্যোদয়। সবেমাত্র এই আরম্ভ হয়েছে। প্রশস্ত গঙ্গার একেবারে শেষ প্রান্তে, ও-পারের নীল আকাশ আর নীচের নীলাম্বু জলবিস্তারের মাঝখানটিতে একটি অর্ধস্ফুট জ্যোতিঃকমল। কোন্ অদৃশ্য দেবতার চরণে কোন্ এক অদৃশ্য পূজারীর পুষ্পাঞ্জলি। হঠাৎ সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা; উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ।

সুষুপ্তির আচ্ছন্নতাটুকু লেগে রয়েছে মনে তখনও। তারই কুহেলীর মধ্যে একটি একটি করে সব মনে পড়ছে, বাড়ি ছেড়ে বেরুনো থেকে মালবাহী জাহাজের এই কোণটুকুতে এসে বসা—একটি দিনে সম্পূর্ণ একখানি জীবন—কত বিচিত্র সুখ-দুঃখের নব-নব উপলব্ধি দিয়ে গড়া জী:ন। ওপারে ফেলে আসা……কোন্ এক নাকি অশুভ লগ্নে আরম্ভ করা।……মনটা যেন অলীক আর বাস্তবের মাঝখানে দোল খাচ্ছে। স্টীমার। ঠিকই। তা হলে কিন্তু অত যাত্রী সব কোথায় গেল?

আরও ভালো করে জেগে ওঠবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম রেলিঙের ধারে। একটা কুলি সিঁড়িতে আওয়াজ তুলে ছুটে এসে দাঁড়াল; বলল—"হুজুর, উঠে পড়েছেন তা হলে? আমি ঠিক করেছিলাম, ঘুমুন ততক্ষণ, আর সবাইকে তুলে দিয়ে এসে একেবারে শেষে নিয়ে যাব।"

ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে তীরে উঠছি ধীরে ধীরে। ক্লান্তি আছে, কিন্তু যেন দুঃখকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে উঠে চলেছি। আসিনি কালও এমনি করেই পদে পদে ক্লান্তিকে ঝরিয়ে দিয়ে, দুঃখকে জয় করে?

উঠে একবার ঘুরে চাইলাম, ঘাটলগ্ন মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-মন্ত্রধ্বনি আরও উদাত্ত হয়ে উঠেছে। দিগন্তের সেই জ্যোতিঃপদ্ম পূর্ণবিকশিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার আলো। এ আলো, এ সামগীত কালজয়ী যেন, আমার ওপারের ফেলে-আসা জীবনের ওপর পড়েও সমস্ত সুখ-দুঃখকে একটি অনির্বচনীয় আনন্দে সার্থক করে তুলেছে।

সমাপ্ত